ভারতীয় চলচ্চিত্রের আধুনিক পর্ব

সত্যজিৎ চৌধুরী

আমাদের চলচ্চিত্র-সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাসে একটা বড়ো বাঁক এল সত্যজিৎ রায়ের কাজে। সব শিল্পের ইতিহাসেই এমন ক্রান্তি আসে কোনো বড়ো প্রতিভাকে আশ্রয় করে। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের হাতেই ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রথম শিল্পের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হল—এমন সিদ্ধান্ত কি সমীচীন?

আমাদের চলচ্চিত্রে শুদ্ধ চিত্র-ভাষা, দৃশ্যবস্তু নির্ভর, অনন্য ভাষার প্রতিষ্ঠা অবশ্যই বেশ বিলম্বিত। কিন্তু আজকের মন নিয়ে স্মৃতির পথে দূরের অভিজ্ঞতায় গেলে কখনো কখনো এক-একটা দৃষ্টান্তে বিস্ময় লাগে। প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি'-র (১৯৩৭) সূচনা স্মরণ করুন। নায়ক শিল্পী। জীবনযাপনে স্ত্রীর সঙ্গে তার দূরান্ত ব্যবধান। একটি দৃশ্যপুঞ্জে (সিকোয়েন্স) প্রমথেশ বড়ুয়া এই সুদূরতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। একটার পর একটা বন্ধ দরজা খুলে খুলে এগোয় শিল্পী নায়ক। বন্ধ দরজার চিত্রকল্পগুলি কী অসামান্য তাৎপর্যে গল্প-মুখটি প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। হতে পারে—এ দৃশ্যপুঞ্জ হঠাৎই পরিচালকের বোধে এসে গেছে। হয়তো খুব সচেতনভাবে নয়ও। কিংবা হয়তো কোনো বিদেশি ফিল্মের প্রভাব-ছায়ায় কল্পিত। তবুও আমাদের চলচ্চিত্রে ফিল্মের ভাষার বিকাশের কথায় এমন তাৎপর্যময় প্রয়োগের দৃষ্টান্ত উপেক্ষা করা যায় না।

তেমনি 'কল্পনা'-য় (১৯৪৮) উদয়শঙ্কর-এর কাজ দেখার বিস্ময়-স্মৃতি ভুলতে পারি না। জাঁ রেনোয়া না কি বলেছিলেন, 'এ ছবিতে উদয়শঙ্করের অসামান্য প্রতিভা সর্বত্র জ্বলজ্বল করছে... কিন্তু তিনি নিজেকে দেখাতে বড়ো বেশি ব্যস্ত... শিল্পীর আরও বিনয় থাকা উচিত।' (*চলচ্চিত্র প্রথম পর্যায়*—সিগনেট প্রেস, ১৯৫০, পৃ.৫৪)। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাক্যাংশের সমালোচনা 'কল্পনা'-র গৌরব মলিন করে না। ভাবতে হয় জাঁ রেনোয়া-র চোখে যে জ্বলজ্বলে প্রতিভা ধরা দিল সে কি নাচের প্রতিভা না চলচ্চিত্র শিল্পীর প্রতিভা এই জিজ্ঞাসা নিয়ে 'কল্পনা' আরো একবার দেখতে হয়। গল্পের সুতো একটা আছে। একজন নৃত্যশিল্পী উদয়নের ব্যক্তিগত বিকাশগাথায় সে সুতো কাজেও আসে। আবার উদয়নের ব্যক্তিগত বিকাশ, পূর্ণতা, নাচেরই এলাকায়। ব্যক্তিগত সৃজন এবং সংগঠন—দুই স্তরে চলাচল তার। সেই সূত্রেই ফিল্মটির কাঠামোর মধ্যে এসে যায় প্রতিকূল বাস্তব, দুস্থ স্বদেশ। ফিল্মের যে কোনো উত্তীর্ণ কাজে অনন্য এক ছন্দ পাই। 'কল্পনা' তেমনি আদ্যন্ত একটি ছন্দোময় বিন্যাসে সংহত কাজ। দৃশ্য এবং দৃশ্যপুঞ্জগুলির চলনে সেই ছন্দ ফোটে। বিষয়টা নৃত্যনির্ভর বলেই আসে এক ধরনের রীতিবদ্ধতা (স্টাইলাইজেশন)। সাধারণ মানুষজনের হাঁটাচলাতেও কোনো-না-কোনোভাবে এই রীতিবদ্ধতার মেজাজ ধরা আছে। হয়তো তাই থেকে থেকে দেহভঙ্গির সাধারণ গতি অনায়াসে রীতিমতো নাচে

মেতে ওঠে কোনোই ধাক্কা না দিয়ে। পুরো ছবিটি দেখার পরে মনে যে রেশ থাকে তা একটা পূর্ণাঙ্গ, বহুধা বিকশিত, অথচ একতায় বাঁধা নৃত্যের। এই বিষয়টিকে উদয়শঙ্কর করেছিলেন ফিল্মের ভাষায়। সূচনা থেকেই ফিল্মের ভাষার সচেতন প্রয়োগ সচকিত করে তোলে। বাচ্চা ছেলেদের মারপিট, দৌড়ঝাঁপ ক্যামেরা যে ধরছে সূচনায়—সেই ধরাতেও কৃৎকৌশল চমৎকার। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে টুকরো টুকরো শট নেওয়া এবং দৃশ্যপুঞ্জ গড়ে তোলার এতটা নিপুণতা হঠাৎ হয়ে যাওয়া জিনিস নয় আদৌ। এই নিপুণতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে স্বপ্নদৃশ্যটিতে, ইনসারশন এবং মিক্সিং-এর দক্ষ প্রয়োগে দৃশ্যটিকে নিয়ে গেছেন সুররিয়ালিস্ট তাৎপর্যে। আবার ওই ক্যামেরাই ধরে ডাস্টবিন থেকে খাবার কুড়োনো ছেলেটিকে। আজকের জিজ্ঞাসু দর্শক ফিল্মে আবিশ্ব শ্রেষ্ঠ কাজের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নিয়েই 'কল্পনা' দেখতে যাবেন এবং সেই শিক্ষিত দৃষ্টিতে মানবেন, 'এ ছবিতে উদয়শঙ্করের অসামান্য (চলচ্চিত্র-সৃজন) প্রতিভা জ্বলজ্বল করছে।' রেনোয়া-র বাক্যটিতে এভাবে একটু সংযোজনে দ্বিধার কোনো কারণ নেই।

'কল্পনা' সম্পর্কে আরো কিছু কথা মনে আসবে। এই ফিল্মে উদয়শঙ্কর বাণিজ্যিক ফিল্মের প্রযোজকদের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছিলেন। শিল্পিত চলচ্চিত্রের পক্ষ নিয়ে এই অবলোকনে ধরিয়ে দিয়েছিলেন চলচ্চিত্র শুধুই প্রমোদপণ্য নয়। ষাটের দশকের আগে কথাটা এ-দেশে প্রতিষ্ঠা পায়নি। প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য দেশময় ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন গড়ে তুলতে হল।

দূরদর্শনের মাধ্যমে প্রায় দু-দশক আগে নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল'কে (১৯৫০) দেখার সুযোগ হয়েছিল। আজকের বিচক্ষণ দর্শকরা 'ছিন্নমূল'কে আমাদের ফিল্ম-শিল্প বিকাশের একটা ধাপ বলে মানবেন নিশ্চয়। মানতে হয়, আমাদের এখানে নিওরিয়ালিস্ট ফিল্মের ইতালীয় কীর্তির সঙ্গে পরিচয়ের অনেক আগেই আঙ্গিকটি নিয়ে পরীক্ষা হয়েছিল। খণ্ডিত স্বদেশের বিপন্ন বাস্তবকে ক্যামেরার চোখে ধরার এই উদ্যোগটা সমূহ সাহসের। কিছুই সাজানো নয়। আকাঁড়া বাস্তবকে পর্দায় তুলে ধরা, সেজন্য নিমাই ঘোষকে কাজ করতে হয়েছে প্ল্যাটফর্মে, পথে পথে। অভিনেতৃ দলের সঙ্গে সাধারণ মানুষদের মিশিয়ে দেওয়া, স্বাভাবিক আলোর উপরে নির্ভর করে কাজ করা—এসব উদ্‌ভাবন এবং প্রয়োগ সম্ভব হয়েছিল। কোনো নিটোল শিল্পায়ন নয়, বিষয়ের তীব্রতায় গোটা প্রকল্পটি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ভিন্ন মেজাজে। ফিল্মটির সর্বাঙ্গে সেই দুঃসময়ের চিহ্ন লেগে আছে। প্রতিটি দৃশ্যপুঞ্জ স্নায়ুর সমতা ছিন্নভিন্ন করে দেয়। সব ধ্বনি ছাপিয়ে ওঠে সেই বৃদ্ধার আর্ত প্রতিরোধের স্বর—'আমি যামু না যামু না'। ইনি অভিনেত্রী নন আদৌ। ঠিক এই ধারাতেই 'ছিন্নমূল'-এর অন্যতম অভিনেতা ঋত্বিক ঘটক ১৯৫২-য় তুললেন 'নাগরিক'। বিষয় ভাবনায় চলমান বাস্তবে মুখ ফেরানোর দিক থেকে 'নাগরিক' স্মরণীয়—যদিও এ-ছবিতে ফিল্মের ভাষায় ঋত্বিকের দখল শিক্ষানবিশি স্তরের।

চলচ্চিত্র-সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা বিকাশের এই স্তরেই ১৯৫২-য় ভারতে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হয়েছিল। মনে আছে, কলকাতায় অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে টিকিটের জন্য মারদাঙ্গা হয়নি। অল্প আয়াসেই বেশ কিছু ছবি দেখা সম্ভব হয়েছিল। চলচ্চিত্র রুচিতে সুবাতাস লাগল। এই অভিজ্ঞতা থেকে ঠিক কী সুচেতনা এল? তখনকার হাওয়ায় ভেসে ফিরত এমন অনেক টুকরো কথা মনে আসে। কিছু লেখালিখিও হয়েছিল তখন। একটা স্থির বোধ কাজ করছিল ওই পরিবেশে। এমন কাজ হয়ে গেছে ফিল্মে যা গল্প বা অভিনয়ের কুশলতা—সব ছাড়িয়ে শিল্প সৃজনের চূড়া স্পর্শ করে, যে কাজ দাবি করে দর্শকের শিল্পগতসংবেদন। প্রমাণ পাওয়া গেল, ফিল্মের ভাষা বাস্তবের উপলব্ধিকে অমোঘ শিল্পরূপ দিতে পারে। একটু বড়ো পরিসরে, সাধারণ দর্শকেরও একটা অংশের মধ্যে এই বোধটি প্রতিষ্ঠা পেল। এবং এই অব্যর্থ শিল্পভাষায় আমাদের বাস্তবকে, বাস্তবের বহুমুখ সত্যাসত্যকে ধরার পরীক্ষা এবং উদ্যম যেন অনিবার্য হয়ে উঠল।

এমন হবারই কথা। হাওয়ায় যে বীজ ভেসে আসে, মাটির আশ্রয় পেলে, পুষ্টি পেলে সে তো ফলবান হবেই। আমাদের মনের মাটি সেই পুষ্টি জোগাতে পারল এত দিনে। হলিউডের উৎপাদন প্রমোদপণ্য, দেশের পরিচালক-পরিবেশক-দর্শকের রুচিপ্রবৃত্তি যে বিকারের অভিমুখী করে রেখেছিল, এতদিনে যেন সেই স্রোত প্রতিহত করার জোর পাওয়া গেল। মনে পড়বে, ১৯৫০-এ সিগনেট প্রেস থেকে *চলচ্চিত্র: প্রথম পর্যায়* নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন ছয়জন—কমল [কমলকুমার] মজুমদার, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, নরেশ গুহ, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ সেন। রুচির হাওয়া বদলের নজির হিসেবে সংকলনটিকে একটি মূল্যবান দলিল মনে হয় আজ। সংকলনের অনেক লেখায় হলিউড প্রভাবিত হিন্দি এবং বাংলা ফিল্মের বিরুদ্ধ-সমালোচনা অত্যন্ত তীব্র। সুপ্রিয়া দাশগুপ্ত লিখছেন, 'বিভিন্ন দেশের মন আলাদা, মানুষ আলাদা, জীবন আলাদা; সিনেমায় যদি সেই জীবনের সুষ্ঠু প্রকাশ হয় তবেই তার আলাদা চেহারাটি ফুটে ওঠে। আমাদের সিনেমায় আমাদের দেশীয় জীবনের প্রকাশ নেই, তাই হলিউডের ছাঁচে আমাদের সিনেমার ছবি সরাসরি ঢালাই। আমাদের ছবির বর্ণনাভঙ্গি হলিউডের, কথার, সংগীতের প্রয়োগ হলিউডি, হাস্যরস হলিউডের গ্যাগ-এর ধাঁচে বাঁধা। দর্শকের প্রতি আবেদনের ঢং পর্যন্ত অনেকখানি মার্কিনি। মনে রাখতে হবে যে শ্রেষ্ঠ মার্কিন ছবি বলতে বোঝায় গ্রিফিথ, চ্যাপলিন, মুষ্টিমেয় কয়েকজন পরিচালক, ও ওয়েস্টার্ন-এর সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। কিন্তু এর বাইরে যে হলিউড সেটাই আজকাল বাজার চলতি এবং তারই গৎ-এ আমাদের সিনেমাকারদের চিন্তা বাঁধা।' ('ভারতীয় চলচ্চিত্রে হলিউড প্রীতি', *চলচ্চিত্র প্রথম : পর্যায়*, পৃ. ৩৫) ভারতীয় পরিচালকদের উচিত মার্কিন মুলুক থেকে চোখ ফিরিয়ে ফরাসি-ইতালীয়-রুশ-জার্মান চলচ্চিত্রের মর্ম বুঝতে চেষ্টা করা—লেখাটিতে এই আহ্বান ছিল। 'শ্রেষ্ঠ ফরাসী ছবি যে একান্তভাবে ফরাসী, কিছুতেই তাকে মার্কিন বলে ভুল করা সম্ভব নয়;

আবার প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত জার্মান সিনেমার যে একটি অদ্বিতীয় রূপ আছে যা কেবলই জার্মান, আর কিছু নয়—এই জ্ঞান আমাদের সিনেমা মহলে এখনো পৌঁছায়নি। তাই ভারতীয় সিনেমায় ভারতীয়তা নেই, বাংলা সিনেমায় বাঙালীয়ানা নেই। অথচ মেক্সিকো ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মতো ক্ষুদ্র দেশেও চলচ্চিত্রের একটা নিজস্ব দেশীয় চেহারা আছে।' ('ভারতীয় চলচ্চিত্রে হলিউড প্রীতি', *চলচ্চিত্র:প্রথম পর্যায়*, পৃ. ৩৫)

এই সময়ে জাঁ রেনোয়া কলকাতায় এলেন তাঁর 'দি রিভার' (১৯৫০) ছবির কাজে। সেই স্মৃতি সত্যজিৎ রায় লিখেছেন 'তাঁর মনোমুগ্ধকর ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে' রেনোয়া সত্যজিৎ রায়দের সঙ্গে বড়ো আন্তরিক কথা বলতেন। হলিউঠে ছবি করার বিপত্তি একদিন বুঝিয়ে বলেন। ওদের অতিরিক্ত শৃঙ্খলাই সর্বনেশে। একেবারে নিখুঁত কাজ চায়। ফলে খুঁটে খুঁটে প্রতিটি জিনিস পরীক্ষা করা এক বাতিক। রেনোয়া বলছেন, 'শব্দ কি রকম উঠছে তার পরীক্ষা হবে, একবার নয় দুবার। ফলে নিখুঁত শব্দটি পাবেন। ভালো। তারপর পরীক্ষা হবে আলো কেমন আছে, সেও দুবার করে। ফলে নিখুঁত আলো পাবেন। সেও ভালো। কিন্তু ডিরেক্টারের সৃষ্টিপ্রেরণার উপরেও যখন এইরকম পরীক্ষা চালাতে আসে—তখন ব্যাপারটা বিশেষ সুবিধের দাঁড়ায় না। ('কলকাতায় রেনোয়া', *চলচ্চিত্র : প্রথম পর্যায়*, পৃ. ৪২) কলকারখানার উৎপাদনের মতোই ফিল্ম উৎপাদন হয়ে দাঁড়ায় একান্ত যান্ত্রিক। সৃজন-কল্পনা খেলবার জায়গা পায় না। রেনোয়া বুঝিয়েছিলেন, ভালো ফিল্ম করার জন্য, বাস্তবের মর্ম শিল্পিত করার পক্ষে দৈন্য বরং ভালো। দৈন্যের মধ্যেই ইতালিতে কত মহৎ কাজ করেছেন নব্য বাস্তববাদী পরিচালকেরা। রেনোয়া বলেন, 'যুদ্ধের ফলে ইতালীয় ছবির কি পরিণতি হয়েছে দেখুন। 'ব্রিফ এনকাউণ্টার'-এর [পরিচালক ডেভিড লীন, ১৯৪৫] কথা একবার ভাবুন। লণ্ডনে যদি তখন অমনভাবে বোমা না পড়ত তাহলে ওরকম মহৎ একটি ছবি তোলা সম্ভবপর হত বলেই আমি মনে করি না। আমার মনে হয় হলিউডেও ভালোমতো একবার বোমাবর্ষণ প্রয়োজন...'। ('কলকাতায় রেনোয়া', *চলচ্চিত্র : প্রথম পর্যায়*, পৃ. ৪৩), রেনোয়া-র চূড়ান্ত পরামর্শ ছিল, 'দেখুন, হলিউডের প্রভাব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজেদের দিশী রুচি কখনো যদি গড়ে তুলতে পারেন, আপনারা তাহলে একদিন মহৎ ফিল্মের জন্ম দিতে পারবেন।' ('কলকাতায় রেনোয়া', *চলচ্চিত্র :প্রথম পর্যায়* : পৃ. ৪৬)

মনের জমি এইভাবে তৈরি হয়ে উঠেছিল। প্রথম বিশ্ব চলচ্চিত্র উৎসব অভিজ্ঞতার এক উজ্জ্বল সম্ভার আয়ত্তে এনে দিল। ভারতীয় চলচ্চিত্রে শিল্পমুক্তির সচেতন উদ্যোগ জেগে উঠল। না উঠলে প্রমাণ হত, শিল্পের এই আধুনিকতম মাধ্যমটিতে ভারতীয় প্রতিভা নিষ্ফলা। তা যে নয়, সে প্রমাণ বিক্ষিপ্ত হলেও কিছু আমাদের স্মৃতিতে রয়ে গেছে। শিল্পসিদ্ধ নিটোল কাজ সকলে পেরে ওঠেন না, কিন্তু মাঝারি কাজেও কালের

প্রবণতাটা ধরা যায়। আজ স্মরণ করতে হয়, ১৯৫৩ সালে সুধীর মুখোপাধ্যায় 'বাঁশের কেল্লা' তুললেন। স্বাভাবিক গোধূলি আলোয় হাতে-ধরা মশালের আলোয় ছবি নেবার এবং শব্দ নিয়ে বেশ তাৎপর্যময় পরীক্ষা ছিল এই কাজটিতে। বিশেষত পরিবেশগত বাস্তবতার জন্য বেশিরভাগ শ্যুটিং করা হয়েছিল স্টুডিয়োর বাইরে, আউটডোর-এ। সুধীর মুখোপাধ্যায় এই ছবির শ্যুটিং-এ শব্দের জন্য ইতালি থেকে কিনেভক্স মেশিন এনেছিলেন। এই মেশিনটি সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালী' তোলার সময়ে ব্যবহার করেন। ('সুধীর মুখার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎকার', *চিত্রভাষ*, ২৮ বর্ষ ৩য়-৪র্থ ও ২৯বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা) খুব বড়ো কোনো দাবি আজ আর করা চলে না এই ছবি সম্পর্কে, কিন্তু দৃষ্টি বদলের, সাহস করে নতুন পরীক্ষার একটা দৃষ্টান্ত নিশ্চয়। সেই সময়ের আরো কোনো কোনো কাজে এই ধরনের রীতি ভাঙার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে বিমল রায়ের 'দো বিঘা জমিন' (১৯৫৩) বিশেষভাবে মনে আসে। বলরাজ সাহানির বিচক্ষণ অভিনয় শুধু নয়, স্টুডিয়োর বাইরে তোলা অনেক দৃশ্যপুঞ্জ মনে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। ভারতীয় বাস্তবের মর্মে যাবার একটা উন্মুখতা এ ছবিতে ছিল। এবং স্মরণীয়, একই কালে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পূর্ণ যুবক, ৩৪ বছর বয়সী সত্যজিৎ রায় একটু একটু করে 'পথের পাঁচালী' (১৯৫৫) তোলার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

২

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস 'পথের পাঁচালী'র আগে আর পরে—এইভাবে বিভাজিত। 'পথের পাঁচালী'র মূল্যগৌরব নিয়ে কোনো মতভেদও নেই। শুধু দেখছিলাম, 'পথের পাঁচালী' হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়। নতুন এক শিল্পগত দায়িত্ববোধের উন্মেষপর্বের চূড়ায় এল 'পথের পাঁচালী'। সেই প্রাক ইতিহাস উপেক্ষা করা যায় না।

সব কালেই বড়ো সৃজনী-প্রতিভার দায় দুই মুখে—শিল্পে এবং জীবনে। কিংবা জীবনে এবং শিল্পে। আপন দেশ-কালে শিকড় নেই এমন কোনো নিরালম্ব স্রষ্টা হয় না। কোনো স্রষ্টার কাজের মূল্যায়নে তাই তাঁর দেশকাল জড়িয়ে জীবনের এবং শিল্পের দায় জড়িয়ে নানান প্রশ্ন এসে যায়। চলচ্চিত্রের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের সূত্রে মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রে তাঁর প্রায় ৩৫ বৎসর ব্যাপ্ত সৃষ্টিময় জীবনে যে জগৎচিত্র রচনা করে তুলেছেন কী তার তাৎপর্য। ফিল্মের শিল্পিত ভাষা তাঁর সৃষ্টিতে অশেষ বৈচিত্র্যে প্রয়োগ করেছেন, সে হল এক দিকের কথা। বিশ্বের যেখানেই ফিল্ম চর্চা হবে এই শিল্পগত উৎকর্ষের নিদর্শন থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তারই সঙ্গে জড়িয়ে প্রশ্ন আসে তাঁর দেশ, তাঁর সময়, তাঁর সন্নিহিত জীবনপ্রবাহ সম্পর্কে কোন উপলব্ধি আধৃত করার জন্য তাঁকে ফিল্মের শিল্পিত ভাষার আশ্রয় নিতে হল। বড়ো প্রতিভার সৃষ্টিকাজে দর্শনের শিরদাঁড়া থাকে। নিজস্ব দৃষ্টি থেকে, বাস্তবের মর্ত, সৃষ্টির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে চলেন বলেই ছোটোবড়ো

সব কাজ মিলিয়ে একটি স্বয়ম্ভর জগৎ রচিত হয়ে ওঠে। সত্যজিৎ রায় ভারতীয় চলচ্চিত্রকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—এমন উচ্চারণ বহু কণ্ঠে শুনে এসেছি। তারপরেও প্রশ্ন থাকে, কী তাঁর সেই বাস্তবের দর্শন? বাস্তব বলতেই বা তিনি কী বুঝতেন? সেই দর্শনে তাঁর স্বদেশ, তাঁর বিশ্ব, তাঁর কাল কী তাৎপর্যে ধরা দিয়েছিল? আজ এই জিজ্ঞাসা নিয়ে তাঁর সৃষ্টির ভুবনে গেলে হয়তো একটা সুস্থির ধারণা গঠন করে নেওয়া যাবে—কারণ এখন এই ভুবনটি খানিকটা কালের দূরত্ব থেকে সমগ্রভাবে দেখার সুযোগ পাচ্ছি। এই দেখায় অবশ্য ফিল্মগুলি সৃষ্টিকালের পারম্পর্য অনুযায়ী না দেখলেও চলত। কারণ এখানে সত্যজিৎ রায়ের ব্যক্তিগত বিকাশের ইতিহাস, জিজ্ঞাসার বিষয় নয়, বিষয় তাঁর সৃষ্টির ভুবনে আধৃত বাস্তবের স্বরূপ। এই ধারণা স্পষ্ট হলে হয়তো ধরা যাবে ভারতীয় চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায় যে দায়িত্ব চেতনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কী তার বিশিষ্টতা। কী বা তাঁর উত্তরাধিকার।

ফিল্মে সত্যজিৎ রায়ের তত্ত্বগত অবস্থানের মূল কথা, 'চলচ্চিত্রের প্রধান উপকরণ হচ্ছে মানবজীবন, কাজেই মানব-ইতিহাসের সঙ্গে তার ইতিহাসও অঙ্গাঙ্গী গ্রথিত। মানব সমাজের প্রতিটি পরিবর্তন তার চিহ্ন রেখে গেছে চলচ্চিত্রের বিকাশের পথে। (*চলচ্চিত্র: প্রথম পর্যায়*, পৃ. ১২) উক্তিটি পঞ্চাশ সালের। সত্যজিৎ রায়-এর এই রচনাটির শিরোনাম 'বাস্তবের পথে চলচ্চিত্র'। রচনাটি তাঁর চিন্তার গতি সূচিত করে। সত্যজিৎ রায় মানবেন, ফিল্মের স্রষ্টা যে শিল্পী, মানব-ইতিহাসের, মানব-সমাজের বাস্তবকে শিল্পিত প্রকাশে নিয়ে যাবার দায় আছে তাঁর। এবং মানব-ইতিহাস, মানব-সমাজ কালে কালে এবং দেশে দেশে নির্দিষ্ট রূপ নেয়। শিল্পীমাত্রেই কাজ করেন নিজস্ব দেশ-কালের বাস্তব জমিতে দাঁড়িয়ে। সেই হল তার সন্নিহিত বাস্তব। এই বাস্তবের অনুগত হয়ে সৃজনের কাজে কিছু পদ্ধতির প্রশ্ন ওঠে। কীভাবে ধরব বাস্তবের মর্ম? এ-প্রশ্নের সূত্রে মাস্টারমশায় নন্দলাল বসুর শিক্ষার কথা সত্যজিৎ একটি ছোটো লেখায় স্মরণ করেছেন। বলেছেন, গাছ সম্পর্কে মাস্টারমশায় যা বলতেন আমার মনে পড়ে। সাধারণত গাছ আঁকা হয় আগা থেকে। কিন্তু মাস্টারমশায় এরকম আঁকতেন না। বলতেন, গাছের দিকে চেয়ে দ্যাখো, এখনকার এই রূপ কীভাবে পেয়েছে অনুভব করো। নীচ থেকে বেড়ে উঠেছে; তলার শেকড় থেকে শাখা আর উপরের প্রশাখার দিকে এর খাড়াই গতি। গাছটি অন্তর্গত নিজস্ব ছন্দ, প্রাণ-ছন্দের রূপ অর্জন করেছে। তোমাকে সেই রূপটিই তুলে আনবে হবে।

'I am reminded of what master-masai used to speak about trees. Usually one would start drawing a tree from the top. But with master-masai it was not so. He would say : "Look at the tree and feel how it has grown up to what it now is. It has grown from below; its dynamism is vertical, from the roots below to the branches and sub-branches at the top side. The tree has acquired a form of its own inner rhythm, its

essential rhythm. You shall have to bring that form out." ' MY APPRENTICESHIP UNDER NANDALAL', *World Window*, *Nandalal Number*, Vol-I, No III, April-June 1961, pp. 17-18) গাছের প্রাণ-ছন্দের গতি ধরার জন্যে তুলির গতিও নীচ থেকে উপরে যাবে—এই ছিল তাঁর নির্দেশ। আপন উপলব্ধির মধ্যে বাস্তবকে তুলে আনার এই দৃষ্টি সত্যজিৎ পেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে নন্দলালের কাছে শিক্ষানবিশির সময়ে। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন—এ দৃষ্টি না পেলে, 'আই ডু নট থিঙ্ক মাই পথের পাঁচালী উড হ্যাভ বিন পসেবল'।

কথাটা আমাদের সংবেদনে রণিত হয় এবং বহুমুখী তাৎপর্য বিকিরণ করে। এ এমন এক নন্দন-দৃষ্টি যা লক্ষ্য-বৃত্তের বাস্তবকে ভেতর থেকে ধরতে চায়। হোক সে প্রকৃতি বা জীবন। হোক সে ইতিহাসের কোনো পর্ব। সত্যজিৎ রায় আমাদের চলচ্চিত্রকে আমাদের জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে লগ্ন করে দিয়েছেন একথা বারবার বলি। দুই আড়াই শতাব্দী ধরে দুর্গত স্বদেশের যে সংকট আমাদের আড়ষ্ট করে রেখেছে, সেই ইতিহাস উপেক্ষা করে কোনো প্রকৃত ভারতীয়-বাস্তবের বোধ দাঁড়ায় না। সত্যজিৎ রায় এই বাস্তবের মর্ম কেমনভাবে ধরেন বুঝবার জন্য তাঁর ফিল্মগুলির নির্মাণকালের পারম্পর্য একটু অদলবদল করে নেব।

প্রথমে দেখব 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি' (১৯৭৭)। প্রেমচন্দের আখ্যানটি প্রতীকী। এ আখ্যানে মির রোশন আলি (সঈদ জাফরি) আর মির্জা সাজ্জাদ আলি (সঞ্জীবকুমার)—দুই অভিজাত নিরন্তর দাবা খেলে চলে। সমান্তরাল আখ্যানের ধারায় অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্ (আমজাদ খান) জেনারেল আউট্রামের (স্যর রিচার্ড অ্যাটেনবরো) হাতে উচ্ছেদ হয়ে যান। ছবিটি শুরু হয় ঔপনিবেশিক শক্তির গ্রাসে চলে যাওয়া একের পর এক চেরিফলের অ্যানিমেশন দৃশ্যে। শেষ হয় ইংরেজ সৈন্য অবাধে অযোধ্যায় ঢুকছে—আর গাছতলায় জমজমাট দাবা খেলার দৃশ্যপুঞ্জে। অযোধ্যায় যা ঘটছে সে প্রকৃতপক্ষে মুঘল শাসন ভেঙে যাবারই আখ্যান। দেশ ক্রমে নৈতিক অবক্ষয়ের চরমে চলে গেল। উত্তরণের সম্ভাবনা হারানো এক সমাজ, সে-সমাজের সে-রাষ্ট্রব্যবস্থার নেতৃ-ভূমিকায় রয়েছে সব আত্মমর্যাদা হারানো ফাঁপা মানুষ। ফিল্মটিতে স্বদেশের এক ক্রান্তিকালের শোচনীয় বাস্তব দৃশ্যমান হয়ে আছে। সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টিতে ক্রমাগত ধ্বস্ত হয়ে যাওয়া ভারতীয় বাস্তবের যাবতীয় দুর্গতির এই হল সূচনা।

সেই দুর্গত ভারতের মুখ দেখি 'পথের পাঁচালী'র (১৯৫৫) ইন্দির ঠাকরুনের মুখে। ইন্দিরকে সরিয়ে নিলে 'পথের পাঁচালী' ফিল্ম দাঁড়ায় না। উপন্যাসটিতে এ-চরিত্র এতখানি অমোঘ মনে হয় না। বিভূতিভূষণের বাস্তব পাঠ এবং সত্যজিৎ রায়ের বাস্তব পাঠে অনেক তফাত। উপন্যাসে মূল জোরটা পড়ে দুস্থ স্বদেশের পটে একটি সংবেদনশীল শিশুর বালক হয়ে ওঠা, বালকের কিশোর হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতার উপরে। বিভূতিভূষণের

রূঢ়তাকে কমনীয় করে তোলার চেষ্টা আছে যা সত্যজিৎ রায় নেননি। আখ্যানটির অকরুণ প্রসঙ্গগুলি—যেমন প্রতিবেশীদের কারো কারো সঙ্গে হরিহরের পরিবারের অবমাননাময় সম্পর্ক, দুর্গার কাঙালপনা, সর্বজয়া-ইন্দির সম্পর্কের প্রায় অমানবিকতা—হয়তো উপন্যাসে তেমন করে আঘাত করেও না মাধ্যমটি ভাষা হওয়ায়। ফিল্মে তো সবটাই সাক্ষাৎ—প্রতিটি ভঙ্গি, দৃষ্টি, চলন প্রত্যক্ষত আমাদের বিদ্ধ করে। সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মে বিধ্বস্ত ভারতবর্ষ যে-মাত্রায় ধরা দেয়, অন্য কোনো মাধ্যমে সে-মাত্রা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর ছিল মনে হয় না।

একটা গাছ আঁকা শিখতে গিয়ে নন্দলাল বসুর কাছে বাস্তব কী, বুঝতে শিখেছিলেন। জরতী ইন্দির চরিত্রে দেশজ মূল্যজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করে দিতে সেই শিক্ষা আশ্চর্যভাবে কাজে লাগান। একটি মাত্র দৃশ্যপুঞ্জ স্মরণ করি এখানে। ইন্দির উঠোনে পা রাখলেই সর্বজয়া ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সীমাহীন নিষ্ঠুরতায় ইন্দিরকে সে জলটুকুও গড়িয়ে দেয় না। নিজে জল গড়িয়ে ইন্দির তৃষ্ণা মেটায়। তারপরে উঠোনের কোণে গাছগুলোয় জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিয়ে বিদায় নেয় ইন্দির। মমতার টান গাছগাছালি অবধি—সে যেন ইন্দিরের সহজাত মনুষ্যত্বের দায়। নিরাশ্রয় জরতীর একদা-বাস্তু তাকে এমন করে টানে। শিকড়ের টান। এমন মৌল মনুষ্যত্বের বিভা কী সকরুণ এইসব দৃশ্যপুঞ্জে। চরম দুস্থতায় ছেয়ে আছে ফিল্মটির জগৎচিত্র—কিন্তু মানবিক কিরণ তবু অন্য তাৎপর্য আলোকিত করে। মরা মেয়ের জন্য সর্বজয়ার বা হরিহরের আর্তির কথা তুলছি না এখানে। সে তো স্বাভাবিক। বরং স্মরণ করি ইন্দিরের সঙ্গে, শিশু দুর্গার 'অবৈধ' লেনদেনের সম্পর্ক। পরস্পরের দিকে চেয়ে কী পরিতৃপ্ত হাসি। বরং মনে করি, দুর্গা চুরি করে এনেছিল যে মালা, সেটি অপুর হাতে পড়ায় সেই মুহূর্তের প্রতিক্রিয়া। পানাপুকুরের পানাগুলি সে অপরাধের চিহ্ন চিরদিনের মতো ঢেকে দিচ্ছে। এসব অতি সূক্ষ্ম, মরমি কাজ—যা আমাদের কেমন যেন উঞ্ছ-নির্ভর জীবনের মলিন আবরণের ভিতর-জগতে নিয়ে যায়। ফিল্মটি জুড়ে পরিকীর্ণ দুস্থ বাস্তবে এবং এইসব মরমি কাজে ক্রমে সত্যজিৎ রায়ের দেশ-দর্শন একটা প্রত্যয়ের জমির মতো সাক্ষাৎ বস্তু হয়ে ওঠে। ইন্দিরের বাস্তু নেই। সে নিরাশ্রয়। কে নিরাশ্রয় নয়? হরিহরও সুদিনের স্বপ্ন দেখে দেখে শেষ অবধি আর পায়ের নীচে মাটি পায় না। বাস্তু ছেড়ে যায়। গল্পের ভেতরের গল্পে গেলে বুঝতে পারি এই হল উপনিবেশের ইতিহাস-নিয়তি। আর এক আখ্যান 'অশনি সংকেত'-এ (১৯৭৩) মন্বন্তরের তাড়নায় ভিটেমাটি থেকে উন্মূলনে সেই নিয়তি ফিরে আসে।

সত্যজিৎ রায়ের জগৎচিত্রে দ্বন্দ্ব বহুমুখ। দেশ ধ্বস্ত হয়ে গেল যে শাসনের চাপে সেই ঔপনিবেশিক প্রভাবের জের চলে আসে অনেকদূর। আমাদের আধুনিকতার প্রচ্ছদকে সত্যজিৎ তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেন। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-য় (১৯৬২), 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ'-এর (১৯৬৫) 'মহাপুরুষ' পর্বে। প্রবল প্রতিপত্তিশালী ইন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (ছবি বিশ্বাস)

আপাদমস্তক সাহেব। ইংরেজি বললে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে বলেন। ইংরেজ প্রশস্তিতে উচ্ছ্বাস সীমাহীন। কিন্তু পথে বেরোতে গেলে হাঁচির শব্দে দাঁড়িয়ে যাওয়াও আছে এই ভারতীয় সাহেবের স্বভাবে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে যে সহপাঠীরা জীবন নষ্ট করেছে ইন্দ্রনাথ তাঁদের মূর্খ মনে করেন। প্রভুত্বের সংস্কৃতির জের বয়ে চলেছেন মানুষটি ইংরেজহীন ভারতে। ছবিটির শিরদাঁড়া মেয়ে মনীষা (অলকানন্দা রায়) এবং বেকার যুবক অশোকের (অরুণ মুখার্জি) প্রতিরোধে। রায় সাহেবের অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়, মনীষা বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনিয়ার প্রণব ব্যানার্জিকে (এন. বিশ্বনাথন) প্রত্যাখ্যান করে। অশোক প্রত্যাখ্যান করে রায়সাহেবের দেওয়া চাকরির প্রতিশ্রুতি। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মূল্যজ্ঞান প্রতিষ্ঠা পায় ছবির পরিণামে। ব্যঙ্গ সূচিমুখ হয়ে ওঠে 'মহাপুরুষ' পর্বে পরশুরামের (রাজশেখর বসু) গল্পের বয়ান ধরে। গুরুপদ মিত্র-র (প্রসাদ মুখোপাধ্যায়) শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব মুহূর্তেই উবে যায় বিরিঞ্চিবাবার (চারুপ্রকাশ ঘোষ) উৎকট অলৌকিক মহিমায়। ভারতবর্ষের এই এক মুখ যা ফিরে ফিরে এসেছে সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মে। এ প্রসঙ্গেই 'দেবী'-র (১৯৬০) কথা মনে আসবে। অন্ধ ধর্মবিশ্বাস কালীকিঙ্কর রায়কে (ছবি বিশ্বাস) বিকৃতির চরমে নিয়ে যায়। বাড়ির ছোটো বউ দয়াময়ীর (শর্মিলা ঠাকুর) উপরে দেবীত্ব চাপানোর জের বর্তায় এক নিষ্করুণ ট্র্যাজিডিতে। এই দৃষ্টি অনেকটা সময় পেরিয়ে আর এক স্তব্ধ করে দেওয়া ট্র্যাজিডিতে তীক্ষ্ণতম অভিব্যক্তি পেয়েছিল 'সদ্‌গতি' (১৯৮১) টেলিফিল্মে। ক্রমাগত সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি আবৃত্তি করে ভারতের স্বাধীনতা প্রৌঢ় হল। তবু ঘাসিরামরা (মোহন আগাসে) ডাকলেই দুখির (ওম পুরী) মতো ভূমিহীন কৃষিমজুরকে বেগার দিতে ছুটতে হয়। কারণ গ্রামীণ ক্ষমতা, উঁচু জাতের মানুষ ঘাসিরামদের হাতে। মরেও জ্বালায় দুখি। নিচু জাতের মড়া সৎকার কে করবে। অগত্যা ঘাসিরামকেই পায়ে দড়ি বেঁধে দুখির দেহ ভাগাড়ে ফেলে আসতে হয়। সেই যন্ত্রণাময় দৃশ্যে চোখ রাখার অভিজ্ঞতা ভোলা অসম্ভব—পায়ে বাঁধা দড়ি ধরে দুখিকে ভাগাড়ে নিয়ে যাচ্ছে ঘাসিরাম। ভারতীয় জনসমাজের পরতে পরতে জাতপাত বিচারের কলুষ কেমন অনপনেয়, সে বিশেষ করে টের পাওয়া যায় দক্ষিণ-ভারতে এবং হিন্দি বলয়ে। ভারতীয় সিনেমায় এই প্রসঙ্গটি বহুদিন ধরে প্রতিফলিত হয়ে আসছে—'অচ্ছুৎকন্যা' (পরিচালক ফ্রানজ্ অস্টেন, ১৯৩৬) থেকে 'সংস্কারা' (পরিচালক পট্টভি রাম রেড্ডি, ১৯৭০), হয়ে দক্ষিণ ভারতে একই বিষয় নিয়ে সম্প্রতি তৈরি বেশ কয়েকটি ফিল্ম অবধি। জাতপাতের দ্বন্দ্ব নিয়ে যা কাজ ফিল্মে হয়েছে তার মধ্যে মন্তব্যহীন, ব্যাখ্যা বর্জিত অত্যন্ত নিরাবেগ ভঙ্গিতে বলে যাওয়া 'সদ্‌গতি'র বয়ান বোধহয় তীক্ষ্ণতায় চূড়াস্পর্শী কাজ। পরম ঘৃণ্য কাজ করতে হচ্ছে—অস্পৃশ্যের শব নিয়ে যাওয়ার কাজ—মোহন আগাসের যোগ্য অভিনয়ে বিরাট আকাশের পরিপ্রেক্ষিতে শবটি টেনে নিয়ে যাওয়ার সেই দৃশ্য ভারতীয় বিবেকে খোদাই হয়ে যাবার কথা। প্রতীক মূল্যে দৃশ্যটি অসামান্য।

অপু আখ্যানে ফিরে যাই। অপু উত্তরাধিকার সূত্রে কিছুই পায়নি। পেয়েছিল শুধু সংবেদনশীল মন। পেয়েছিল কিছু স্বপ্ন। নিজের পরিমণ্ডলের দীনতা যতই বৃত্তবদ্ধ করুক—সে সেই গণ্ডির বাইরে যাবার স্বপ্ন যাপন করত। ঔপনিবেশিক ভারতে সেই স্বপ্নের বাস্তব ভিত কত যে সীমাবদ্ধ সেও আমরা মর্মে মর্মে বুঝি 'অপরাজিত'-য় (১৯৫৬), 'অপুর সংসার'-এ (১৯৫৯)। গ্রাম আঁকড়ে থেকে অপু বাবার মতোই পুরুতের বৃত্তি নিতে পারত। কিন্তু আধুনিক বিদ্যার স্বাদ, মেধার শক্তিতে প্রত্যয়বোধ তার মধ্যে বিদ্রোহ আনে। সর্বজয়াকে উপেক্ষা করেই সে কলেজে পড়তে যায়। এই বিদ্রোহের সীমা একটা বি.এ. বা এম.এ. ডিগ্রিতে, একটা চাকরির মাস মাইনের নিশ্চিতিতে সীমাবদ্ধ নয়। ভারতীয় স্বপ্নের সকরুণতা সত্যজিৎ রায় ঠিকই ধরেছিলেন। 'অপরাজিত-য়, 'অপুর সংসার'-এ তাই কোনো লাগামছাড়া স্বপ্নের দৌড় নেই। কাজগুলি সংগতভাবেই নিচু সুরে বাঁধা। অব্যবহিত বাস্তবের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা অত্যন্ত প্রখর। গ্রামের দরিদ্র ছেলে অপূর্ব রায় চাকুরে মধ্যবিত্ত হয়। ভারতীয় বাস্তবে একেই মনে হবে মস্ত বড়ো এক উত্তরণ। আর, একে উত্তরণ বলতে হয় অতি করুণ মুখে।

ভারতীয় বাস্তবকে আরো বড়ো পরিপ্রেক্ষিতে ধরার জন্য তাঁকে বিশেষ বিশেষ কালখণ্ডের চলচ্চিত্রায়ণে যেতে হয়েছে। যেমন 'জলসাঘর'-এ (১৯৫৮), 'চারুলতা'-য় (১৯৬৪), 'ঘরে বাইরে'-তে (১৯৮৪)। এই ফিল্মগুলির আখ্যানে ব্যক্তির নাট্য নিয়ে প্রচুর কথা বলা হয়েছে। আমি লক্ষ করতে চাইছি সময়ের বিশেষ বিশেষ পর্বে সমাজের অন্তর্গত দ্বন্দ্বের দিকগুলিতে কী আলো ফেলে এইসব কাজ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বাঙালি জমিদার বিশ্বম্ভর রায়-এর (ছবি বিশ্বাস) আভিজাত্য ঢাকা পড়ে যায় নব্য শিল্পপতি মহিম গাঙ্গুলির (গঙ্গাপদ বসু) প্রতিপত্তিতে। 'চারুলতা'-র ভূপতিতে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাভিমানী এবং ইংরেজদের দরজায় ভারতীয়ের মর্যাদার দাবিদার নব্য অভিজাত ব্যক্তিত্বের প্রতিভূ চরিত্র পাই। 'ঘরে বাইরে' ভারতীয় ইতিহাসের আর এক সংকটের মূলে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের মতো সত্যজিৎ রায়েরও জিজ্ঞাসা—স্বাদেশিকতার খাঁটি বনেদ কী হবে? বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) বিরুদ্ধে আন্দোলনেই তো প্রথম আমাদের জাতীয় চরিত্রের শক্তি এবং দুর্বলতা একই সঙ্গে ধরা দিয়েছিল। সংহত আন্দোলনের সম্ভাবনা জেগে ওঠা সত্ত্বেও রাজনৈতিক সুবিধাবাদ কী উৎকট পরিণামে পৌঁছোয়! জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। উপন্যাস থেকে একটু সরে গিয়ে সত্যজিৎ নিখিলেশের (ভিক্টর ব্যানার্জি) মৃত্যুতে একই সঙ্গে সংকটের তীব্রতা এবং সংকট প্রতিরোধের সংকল্পের জোর প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সূত্রপাত থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদাঙ্গিক দাঙ্গা থামেনি। এই অভিশাপ উচ্ছেদ করার ব্রতধারীও এসেছেন ধারাবাহিক। গান্ধিজিকেও এই ধারারই মানুষ মনে করতে পারি।

বাস্তবের বিশ্লেষণে সত্যজিৎ রায়ের বিকাশ অনেক ব্যাপ্তিতে গেছে, গভীরে গেছে কালক্রমে। দেশের আধুনিক ইতিহাসের প্রগতি-শক্তি মধ্যবিত্ত স্তরটিতে ভাঙন লেগেছে। 'মহানগর' (১৯৬৩) থেকে এই ভাঙনের দিকে তাঁর দৃষ্টি গেছে। সে ছিল অর্থনৈতিক মন্দার চাপে চাকরির সংকট। এই সংকটের আর এক মাত্রা পাই 'প্রতিদ্বন্দ্বী'-তে (১৯৭০)। ক্রমে নৈতিক মেরুদণ্ডে ঘুণ লাগার ভয়াবহ দিকগুলি উন্মোচনের দায় বোধ করলেন। এই দায়বোধ থেকেই তৈরি হতে পারে 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১), 'জনঅরণ্য'-র (১৯৭৬) মতো, 'শাখা প্রশাখা'-র (১৯৯২) মতো ছবি।

শেষ অবধি সত্যজিৎ রায় কি এক চরম অবিশ্বাসের অন্ধকারের দিকে এগিয়েছিলেন? এ-প্রশ্নে মতভেদ সম্ভব। তা নয় সম্ভবত। না হলে 'গণশত্রু' (১৯৯০) নির্মাণ সম্ভব হত না, 'আগন্তুক' (১৯৯২) তৈরি করা সম্ভব হত না। অশুভ ছায়া সব আলো মুছে নিচ্ছে, নেবে—এমন নেতিতে সমর্পণ করলে কখনো 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' (১৯৬৯) বা 'হীরক রাজার দেশে' (১৯৮০) পরিকল্পিত হতে পারত না।

এভাবে দেখলে উপলব্ধি হয়, সুস্থির এবং বিকাশশীল মনীষার আলোয় সত্যজিৎ রায় আপন দেশ-কালের, স্বদেশের ইতিহাসের অন্তর্গত সত্য নিজের সৃষ্টির ভুবনে শিল্পিত করে তুলেছিলেন। ফিল্মের ভাষার বৈচিত্র্যময় প্রয়োগে তাঁর কাজগুলি এই শিল্পের একটি উজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে। এই জগতে, ভারতীয় বাতাবরণেই মানবচরিত্রের অন্তহীন প্রবণতা ধরা রইল—যেমন থাকে সব বড়ো মাপের সৃজনধারায়। চরিত্র-মূর্তির তাৎপর্যময় এই বৈচিত্র্যে জিজ্ঞাসু দর্শক দুটি বিশিষ্ট অভিব্যক্তি দেখবে। দেখবে মানুষে মানুষে সম্পর্কের বহুমুখী বুনোট এবং দেখবে বিভিন্ন সামাজিক স্তরের প্রতিভূ চরিত্র। দৃষ্টান্তগুলি ঝেঁপে আসে ভাবতে গেলে। মুখ্য গৌণ মিলিয়ে তার দু-একটির উল্লেখ থাক এখানে। মানবিক সম্পর্কের জটিলতার রূপায়ণ প্রসঙ্গে ছিন্ন ব্যক্তিত্বের মেয়ে চারুলতা (মাধবী মুখোপাধ্যায়) উজ্জ্বল হয়ে চোখে পড়বে। তেমনি বিমলাও (স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত) মনে আসবে। অপু সর্বজয়ার প্রচ্ছন্ন সংঘাতের কারুণ্যের কথা বলেছি। মূল্যবোধের ভাঙন মনে এলেই কি 'সীমাবদ্ধ'-র শ্যামলেন্দু (বরুণ চন্দ) বা 'জন অরণ্য'-র সোমনাথের (প্রদীপ মুখোপাধ্যায়) মুখ মনে আসে না? অন্য মাত্রায় মধ্যবিত্তের সুখস্বপ্নের তাড়না আর স্বপ্নভঙ্গের স্বস্তির কথা মনে আসে 'পরশপাথর'-এ (১৯৫৮) পরেশবাবুর (তুলসী চক্রবর্তী) অসাধারণ অভিব্যক্তি ধরে। শোষিতের রুদ্ধ প্রতিবাদ তির্যক অভিব্যক্তি পায় 'সদ্‌গতি'-র দুখির (ওম পুরী) হাতের কুঠার চালনার প্রবলতায়।

এইসব চরিত্র-মূর্তি নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মের স্বয়ম্ভর জগৎটি গড়ে উঠেছে। এই বিশিষ্ট জগৎ তাঁর প্রতিভার প্রসার এবং স্থৈর্যময় বিকাশের স্মারক।

জীবনের মর্মসন্ধানী শিল্পদৃষ্টির গভীরতার বিচারে ভারতীয় চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়ের পরেই ঋত্বিক ঘটককে (১৯২৫-৭৬) স্মরণ করতে হবে। তার কারণ অনেক।

সময়ের দিক থেকে দুজনের কাজ অনেকটাই সমান্তরালভাবে এগিয়েছে। দুজনই আপন উপলব্ধি, আপন ধ্যানের বৈশিষ্ট্য ফিল্মের খাঁটি ভাষায় প্রকাশ করার পরীক্ষা চালিয়েছেন। সত্যজিৎ রায় স্থিতধী, কঠোর শৃঙ্খলাময় ব্যক্তিত্বের মানুষ। শরীর অপটু না হওয়া অবধি বিষয়ে, আঙ্গিকে, তাঁর উদ্ভাবনী কল্পনা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অভিমুখে চালনা করেছেন। শারীরিক সীমাবদ্ধতা মেনে সাধ্যের মধ্যে গুছিয়ে কাজ করে গেছেন। তাঁর পাশে ঋত্বিক ঘটক আবেগতাড়িত মানুষ। জীবনে এবং শিল্পে শৃঙ্খলাময় বিন্যাস দীর্ণ করে উল্লাস বোধ করেন। তাঁর প্রতিভার ধর্ম বিস্ফোরক। প্রতিভার এই স্বভাবে সামান্য উপকরণে প্রবল অভিঘাত সম্ভব করতে পারেন। সাজানো প্রচ্ছদ ছিন্নভিন্ন করে বাস্তবের অসহ্য মুখ ধরে দিতে পারেন। কিন্তু কাজের মধ্যে অসমতা রয়ে যায়। মসৃণতা থাকে না, পেলব হয় না। বাজারের হিসেব বোঝেন না—ফলে বৈষয়িক ব্যর্থতা চরম।

তবুও যা করতে চান, বলতে চান—অব্যর্থ অভিঘাতের মানুষের সংবেদনে বিদ্ধ করেন। তাঁর ছবি উদাসীন থাকতে দেয় না। সত্তার মূল ধরে টান দেয় এবং তুমুল প্রতিক্রিয়া জাগায়—যার পরিণতি প্রবল বিতর্কে।

এই প্রবলতায় ঋত্বিক ভারতীয় আধুনিক চলচ্চিত্রে এক আপসহীন, দায়বদ্ধ শিল্পীর চরিত্রমূর্তি নিয়ে আমাদের সামনে রয়েছেন। তাঁর দায়বদ্ধতার, কমিটমেন্টের নন্দনতত্ত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন :

'লড়ায়ের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যোদ্ধা কাউকে ক্ষমা করে না।... কমিটমেন্ট কথাটার মানে কি? নিজেকে কোথাও সংলগ্ন রাখা। কার সঙ্গে সংলগ্ন করব? সংলগ্ন করতে হলে একটা দ্বিতীয় পক্ষ লাগে।...

...সেটা কি?

মানুষ।

শিশু।

জীবন মৃত্যুকে অস্বীকার করে। সকল শিল্পকে তাই হতে হবে জীবন অনুগামী।

জন্মই জীবন।

শিল্প জন্ম।

এই কথাটা আমরা কখনও ভুলে যেন না যাই। যত ক্লেদাক্ত, বিষাক্ত অভিশাপের ভেতর দিয়ে আমাদের বেরোতে হবে, হবে। শিল্প আমাদের এই দায়িত্ব দিয়েছে। ('শিল্প, ছবি ও ভবিষ্যৎ', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, পুনর্মুদ্রণ: *চিত্রবীক্ষণ: ঋত্বিক সংখ্যা*, জানুয়ারি-এপ্রিল ১৯৭৬, পৃ. ১৯০)

থিয়েটার ছেড়ে ঋত্বিক ফিল্মে এসেছিলেন ব্যাপক মানুষের সামনে নিজের কথা বলবার সুযোগ পাবেন আশা করে। গণনাট্যের সংস্রব একটা আবদ্ধতার মধ্যে নিয়ে ফেলেছিল—আর ওই মঞ্চ থেকে নিজের কথা বলার সুযোগ পাচ্ছিলেন না তেমন। ফিল্মে স্বাধীনতাটা পুরোই পেলেন। 'পথের পাঁচালী' তাঁকে সম্মোহিত করেনি, ফিল্মের বিচারবোধ তীক্ষ্ণ করেছিল। 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন মন্তব্য নিয়ে ভাবলে বুঝতে পারি, ফিল্মে জীবনের আরো গভীর স্তর স্পর্শ করা যায় এটা তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয়ের বাস্তব, বাঙালির বাস্তব ধরেই সর্বজনীন জীবনের বাস্তবে পৌঁছানো যায়—ক্রমে তিনি এই প্রত্যয় আশ্রয় করে কাজ করেন। এইখানে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে ঋত্বিকের অবস্থানগত তফাত আছে। কথাটা সত্যজিৎ রায় নিজেই সরাসরি বলেছেন :

'...আমরা যারা প্রায় গত চল্লিশ বছর ধরে ছবি দেখেছি, তাদের মধ্যে তো প্রায় ত্রিশটা বছর কেটেছে হলিউডের ছবি দেখে। কেননা কলকাতায় তার বাইরে কিছু দেখবার সুযোগ ছিল না সে সময়টা।... আমাদের সকলের মধ্যেই তাই কিছু কিছু হলিউডের প্রভাব ঢুকে পড়েছে। কিন্তু ঋত্বিক কোন এক রহস্যময় কারণে সম্পূর্ণ সে প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল; তার মধ্যে হলিউডের কোনো ছাপ নেই। এটা যে কি করে হয়েছে, সেটা এখনও আমার কাছে রহস্য রয়ে গেছে। যদি প্রভাবের কথা বলতে হয়, আমার মনে হয়, ঋত্বিকের ছবিতে কিছুটা... সোভিয়েট ছবির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়... এই সোভিয়েট ছবির প্রভাব এবং সংলাপে, বিষয়বস্তুতে, ছবির পরিসমাপ্তিতে নাটকের প্রভাব তার মধ্যে ছিল। এই দুটো জিনিস দাঁড়িয়েছিল যে ভিত্তির উপর সেটা একেবারে বাংলার মাটিতে বসানো। ঋত্বিক মনেপ্রাণে বাঙালি পরিচালক ছিল, বাঙালি শিল্পী ছিল—আমার থেকেও অনেক বেশি বাঙালি। আমার কাছে সেইটেই তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় এবং সেইটেই তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান এবং লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।' (*চিত্রবীক্ষণ : ঋত্বিক সংখ্যা*, জানুয়ারি-এপ্রিল ১৯৭৬, পৃ. ১২৫-২৬)

সত্যজিৎ রায়ের হলিউড-প্রীতি জীবনের শেষ অবধি ছিল। অস্কার অভিজ্ঞানটি হাতে নিয়ে রোগশয্যা থেকে উচ্চারিত বাক্য কয়েকটিতে সবাই তার প্রমাণ পেয়েছেন। সে ভিন্ন কথা। কিন্তু ঋত্বিকের হলিউড-গ্রস্ত না হওয়াটা তেমন কী রহস্যপূর্ণ? চলমান ইতিহাসের কোন ঘটনা কোন ব্যক্তিকে কীভাবে প্রভাবিত করবে—তা বলে দেওয়া যায় না কখনো। ঋত্বিক সত্তা পরিচয়ের সংকটে জীর্ণ হয়েছিলেন দাঙ্গাবিধ্বস্ত বাংলা দুই টুকরো হয়ে যাওয়ায়। স্মরণ হবে, ভারতের সর্বত্র স্বাধীনতার অর্থ-তাৎপর্য এক ছিল না। বিশেষত বাংলা আর পাঞ্জাব স্বাধীনতার চুক্তি থেকে বয়ে আসা সংকট আজও ভোগ করছে। এই আঘাতটা শিল্পী ঋত্বিকের পক্ষে নঞর্থক বলি না। বলা উচিত, এই আঘাতে তাঁর সত্তা-পরিচয় নিজের কাছে পূর্ণত উন্মোচিত হল। সে সত্তা, সত্যজিৎ রায়ের ভাষা ভাঙিয়ে বলা

যায়, 'একেবারে বাংলার মাটিতে বসানো'। এটা কি তাঁর ভাবালুতা? ভাবালুতা তো সাবানের বুদ্‌বুদের মতো, তাতে কি মহাকাব্য জন্মায়? ফিল্মের মহাকাব্য—যা খণ্ডিতভাবে নয়; 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০), 'কোমলগান্ধার' (১৯৬১), 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬৫), 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৭৩) মিলিয়ে দেখলে এক বিশালতার রসাবেদনে আপ্লুত হতে হয়। ভাবাবেগের ফানুস ওড়াতে কেউ কি চরম অসুস্থ অবস্থায় জীবন বিপন্ন করে তিতাসের বুকজলে দাঁড়িয়ে শ্যুটিং করে? তাঁর বাঙালি সত্তার সমগ্রতা বলয়িত করে তোলার গরজেই দেশান্তরে(!) যেতে হয়েছিল তিতাস তুলতে। পৃথক বিচারে ছবিগুলিতে অনেক বিচ্যুতি দেখানো যায়, কিন্তু একত্রিত করে দেখায় উদ্ভাসিত হয় একটি মূল ধ্যানের বলয়িত সুসম্পূর্ণ রূপ।

ঋত্বিকের ব্যক্তিস্বরূপ দেশভাগের আঘাতে দিশেহারা হয়েও বিপরীত দোলনে একটি স্থির ভাবাশ্রয় স্পর্শ করতে পারল। স্থির প্রত্যয়ভূমি পেলেন—বাঙালি সত্তা অখণ্ড, বাঙালির সংস্কৃতি অখণ্ড। এ-বস্তু হলিউডের শ্রেষ্ঠ কাজ থেকেও পাওয়া সম্ভব নয়। তাই হলিউড তার কাছে অবান্তর।

ঋত্বিকের দর্শনে বাঙালির বা সব মানুষেরই সত্তা-জিজ্ঞাসা কেন্দ্রস্থ তত্ত্ব। 'অযান্ত্রিক'-এ (১৯৫৮) এই শাঁসটা ধরা যায়। অনেকগুলো জটিল প্রশ্ন জড়িয়ে গেছে ছবিটির তত্ত্বে। যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের কোনো সজীব সম্পর্ক হতে পারে কিনা—এ আধুনিক মনের প্রশ্ন। কিন্তু প্রশ্নটিকে ঋত্বিক আদিম মনুষ্যত্বের স্তরের প্রেক্ষিতে দেখেছেন—যে কারণে ওঁরাও প্রসঙ্গ ছবিতে অনেকটা জায়গা পায়। এবং এই টানে 'বিমল' আর 'জগদ্দল' গাড়িটার সম্পর্কের টানাপোড়েনে উৎপাদনে মানুষের শ্রম কার্যকর করার উপায় যে যন্ত্র, তার সঙ্গে আবেগ অনুভূতির সম্পর্ক একটা চিরায়ত স্বাভাবিক সম্পর্কের মর্যাদা পায়। অন্তত পরিচালক এই গল্পের ফ্রেমের মধ্যে জগদ্দলকে কখনো জেদি, কখনো আদরে বশ, কখনো বা ঈর্ষাকাতর কিংবা অভিমানে সকরুণ করে তোলেন। একে বলা যায় মানবতার বিস্তার—যে বিস্তারে জড় যেন-বা সজীবের ধর্ম পেয়ে যায়। যায় না, কিন্তু একটা মায়ার বাস্তব তৈরি হয়—যা মানব চৈতন্যে অবাস্তব নয়। এই একটা একত্বের বোধ, রবীন্দ্রনাথের শব্দ অন্য তাৎপর্যে ব্যবহার করে বলা যায় এই সর্বানুভূতি—যা শিশুতে পাই, যা আদি মানুষের মনোধর্মে স্বাভাবিক—আধুনিককালে যে একত্ব ভেঙে গেছে। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদক-শ্রমিক পণ্যের উপরে দখল পায় না। এই বিচ্ছিন্নতা তাকে; উৎপাদনের মাধ্যম যন্ত্র থেকে, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও তার ফল থেকে আলাদা করে দিয়েছে। একত্বের আবেগ তার অভিজ্ঞতার বাস্তবে নেই। খণ্ডতার পটে বিমল তাই খাপছাড়া, অবোধ মানুষ।

'অযান্ত্রিক' কোনোভাবে ঋত্বিকের পরের কাজগুলির সংলগ্ন আছে কিনা ভাবতে গেলে মনে হয় এই একত্ব ভেঙে যাওয়া এই খণ্ডতার যন্ত্রণার দিক থেকেই একটা যোগসূত্র পাওয়া সম্ভব।

খণ্ডিত বাংলার ধাক্কায় বিহ্বল ঋত্বিকের যৌবনকাল স্থির প্রত্যয়ভূমি খুঁজে ফেরে রাজনীতিতে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে। অশান্ত অন্বেষণ তাঁকে বাঙালি জাতিসত্তার বাংলার সাংস্কৃতিক সত্তার খণ্ডতার বিপরীতে এক একত্বের চরিতার্থতার স্বপ্নে নিয়ে যায়। সেই স্বপ্নের, সেই স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান রচনায় ঋত্বিক পুরাণ-প্রতিমার আশ্রয় নেন; লোকাচারের, মিলনের, একত্বের প্রসঙ্গ ফিরে ফিরে ব্যবহার করেন। পুরাণে আধুনিকে মিলিয়ে তাঁর ফিল্মের জমি তৈরি হয় এবং সেই অধিষ্ঠান ভূমির অসীম বিস্তার, নানান অনুষঙ্গ আখ্যানবস্তু ঘিরে এমন চিন্তার্থের বলয় রচনা করে যা আখ্যানের যুক্তিযুক্ত বিকাশ ছাড়িয়ে ভিন্ন তাৎপর্যে উত্তীর্ণ হয়। ঠিক এই প্রসারতা এই বোধ-এর জন্যই তাঁর ফিল্ম আঁটোসাটো গড়ন পেল-কি-পেল না মসৃণ হল-কি-হল-না সে-বিষয় গৌণ হয়ে যায়।

ঋত্বিকের কাজের বিচারে তাই ফিল্ম সমালোচনার বাঁধা ছক তেমন কাজে আসে না। গল্পের বুনোট, চিত্রনাট্যের বাঁধুনি, দৃশ্যগ্রহণের বাঁধা রীতি—এ-সব ঋত্বিক খুব একটা গ্রাহ্য করতেন না। কাহিনির যুক্তিযুক্ত বিকাশ ভেঙে মেলোড্রামায় যাওয়ায় তাঁর কোনোই সংকোচ ছিল না। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন এই কাঠামোতেই বলবার কথা প্রবলভাবে অভিব্যক্ত। 'সুবর্ণরেখা'-য় বোনের ঘরে দাদা এল—এ খুব বাড়াবাড়ি রকম আকস্মিকের ধাক্কা। কথাটা তাকে বলায় উত্তর দেন 'ঈশ্বর যার ঘরে যেত সেই ওর বোন'। এমন জবাব স্তব্ধ করে দেয় এবং বোঝা যায় কোনো এক বিশেষ ভাইবোনের গল্প তিনি বলছেন না। এ একেবারেই ভিন্ন উপলব্ধির বয়ান। মনে পড়বে, ঈশ্বর (অভী ভট্টাচার্য) বোন সীতাকে (মাধবী মুখোপাধ্যায়) বলছে—তোকে দেখে মায়ের কথা মনে পড়ে। সীতা বলে ওঠে, আমি তোমার মা-ই তো। মুহূর্তে রোমাঞ্চিত দর্শক নারী-ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যায় এক ঝলক নতুন আলো পেয়ে যান। মানতে হবে ছক ভেঙে দিচ্ছেন ঋত্বিক। 'মেঘে ঢাকা তারা'-য় নীতা (সুপ্রিয়া চৌধুরী) গোটা পরিবারটির উপরে ডানা মেলে থাকে রক্ষয়িত্রী মায়ের মতন। প্রেমিককে হারায় বোনের কাছে, যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে নিজেকে শেষ করে দেয়। ভারতীয় সিনেমার সেই মহান দৃশ্যটি ভাবুন। পাহাড়ের অসীম বিস্তারে, মুক্ত আকাশের অসীমতায় ভেঙে পড়া নীতার আর্ত হাহাকার—'দাদা আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম!' ফিল্মের শিল্প কোন চূড়া স্পর্শ করতে পারে ঋত্বিক দেখিয়েছেন। বাংলার গৌরীদানের উমা আখ্যানকে ঋত্বিক নীতার চরিত্র-প্রতিমায় মিলিয়ে দেখেছেন। তাঁর আখ্যানে গৌরীদান বস্তুত একালের উমার বলিদান। এবং এই ট্র্যাজিডির কারণ একেবারেই রাজনৈতিক বাস্তবে রয়েছে। 'মেঘে ঢাকা তারা'-র নৈতিক সংকট, আর্থিক সামাজিক বিপর্যয়, দেশভাগের জের। সেই বেদনার উৎস থেকেই নীতার তিতিক্ষাময় কমনীয় আশ্চর্য চরিত্রটি আসে। ছবি জুড়ে ঋত্বিক এই মেয়ের অসংখ্য মর্মস্পর্শী চিত্ররূপ সৃষ্টি করেন, আঁকেন বলা উচিত, এবং সেই চিত্ররূপগুলির মরমি আবেদন দর্শকের সংবেদনে জমাট হয়ে যায় বলেই ছবিটি

টেনে নেয় অন্তহীন বিষাদে। কেবলই মনে হয় আমাদের কন্যা নীতার, বা এই বাংলার অপার সম্ভাবনাকে আমরা নষ্টভ্রষ্ট করে দিলাম।

কিন্তু এ কি শুধু বাংলার ট্র্যাজিডি? বিশ্বজুড়েই কি ভাঙন আর নৈতিক ক্ষয় সভ্যতা ধ্বস্ত করে দিচ্ছে না? নীতার নিরাশ্রয়তায়, মৃত্যুতে আমরা যে বিবেক-পীড়া বোধ করি সে পীড়া থেকে মুক্তির ভাবাশ্রয় কি বিশ্বে কোথাও আছে? স্তব্ধ করে দেওয়া ট্র্যাজিডির আবেশের মধ্যে এই বিপন্নতাও মিশে যায়। এই বিপন্নতার সূত্রেই 'সুবর্ণরেখা'-য় দ্বিতীয় যুদ্ধের এক পরিত্যক্ত বিমানঘাঁটির ভাঙাচোরা সব উড়োজাহাজের স্তূপে দুটি ছেলেমেয়ের উচ্ছল ছুটোছুটির দৃশ্য, মেয়েটির হঠাৎ কালী সাজে বহুরূপীর সামনে পড়ে গিয়ে আতঙ্ক প্রাসঙ্গিক। এই দৃশ্যপুঞ্জের তাৎপর্য ঋত্বিক নিজেই ধরিয়ে দেন। তাঁর দুটি উক্তি :

'সেই এরোড্রোমের ভগ্নস্তূপের মধ্যে দিশাহারা হয়ে বিস্ময়মুগ্ধ দুটি বালকবালিকা তাদের বিস্মৃত অতীতকে অন্বেষণ করে ফিরছে। কী নিষ্পাপ দুটি প্রাণী! তারা জানে না তাদের জীবনে যে-সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে তার ভিত্তিভূমি ওইরকম আরো কতকগুলো বিমানপোত। চতুর্দিকের ধ্বংস আর ভগ্নস্তূপের মাঝখানে আজ তারা খেলা করছে। তাদের এই অজ্ঞান-সারল্য কী ভয়াবহ।

'পরে দেখবেন, একটি শিশু মেয়ের, তার দ্যোতনাময় নামটি হচ্ছে সীতা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এ প্রলয় ক্ষেত্রের মধ্যে পরমানন্দে হাততালি দিয়ে গেয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো কালীমূর্তি—The Terrible mother... সুদূর অতীত থেকে যে archetypal image আমাদের haunt করছে সে আজকে দৃঢ় পায়ে সারা জগতে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে তার নাম Hydrogen bomb, তার নাম Strategic Air Command, তার নাম হয়তো বা De Gaulle , হয়তো বা Adeneur হয়তো বা উল্লেখ করা চলে না এমন কোনো নাম।

'আমার কেমন মনে হয়, গোটা মানবসভ্যতা ঐ Terrible mother -এর archetypal image-এর সামনে পড়ে গেছে। আজ সব সভ্যতার জীবন-মরণ সমস্যা ঐ confrontation-এর ওপরে।'

(*চিত্রবীক্ষণ : ঋত্বিক সংখ্যা*, জানুয়ারি-এপ্রিল ১৯৭৬, পৃ. ৪১, ৪৩, ৫৩)

শিল্পচৈতন্যের বিস্তারে ঋত্বিক স্বদেশের দর্পণে বিশ্বকে ধরেন। তার ব্যক্তিস্বরূপ বাংলায় আশ্রিত, কিন্তু এ-বাংলা বিশ্বের মানচিত্রের অঙ্গ, তার বাইরে নয়। ইতিহাস এবং রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সচেতন তাঁর মতো মানুষ কী করে আর 'আমরা বাঙালি' মার্কা বাংলা-প্রেমী হবেন। দেশ-কালের বড়ো প্রেক্ষিত হারান না, কিন্তু প্রশ্নগুলো উঠে আসে সন্নিহিত বাস্তব থেকে। 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'-য় বনের মধ্যে নকশালপন্থী বিপ্লবী ছেলেদের সঙ্গে নীলকণ্ঠর (ঋত্বিক ঘটক) আলাপচারী স্মরণ করুন। কিংবা স্মরণ করুন 'সুবর্ণরেখা'-র হরপ্রসাদের (বিজন ভট্টাচার্য) অদ্ভুত সংলাপ। বিপর্যস্ত ঈশ্বর

আত্মহত্যার উদ্যোগ করছে এমন সময়ে জানালায় হরপ্রসাদের মুখ। হরপ্রসাদ চূড়ান্ত আত্মধিক্কারের স্বরভঙ্গিতে বলে চলে :

প্রতিবাদ করছিলাম। কার প্রতিবাদ, কীসের প্রতিবাদ? এখন হইছে একটা দেওয়ালে দরাম কইর‍্যা ধাক্কা খাইয়া একটা জাঁতাকলে বন্ধ হইয়া আষ্টেপৃষ্ঠে আটকাইয়া আছি।

...

'সে আসল কথা কি জানো ভাইটি, ও প্রতিবাদই করো আর লেজ গুটাইয়া পলাইয়াই যাও, কিছুতেই কিছু যায় আসে না। সব লোপাট। আমরা সব নিরালম্ব বায়ুভূত, আমরা মিইট্যা গেছি। রাত কত হল?... উত্তর মেলে না!

...

'কলকাতায় এখন মজা। দোকানে, হোটেলে, রেসের মাঠে, সে কী বীভৎস মজা। তুমি দাঁড়িয়ে দেখবা আর অবাক হয়ে যাবা। মাইনসে কেমন স্রোতে গা এলাইয়া দেয়—গড্ডলিকা-প্রবাহই সত্যি। ওটাই খাঁটি। ভোগই মুক্তির পথ।'

শুনতে শুনতে আতঙ্কিত হয়ে ভাবতে হয়—আজকে ওই বিবেকতাড়িত লোকটি বিশ্বের ভোগ্যপণ্যের বাজারে শামিল ভারতবর্ষের কলকাতায় বা বোম্বাই বা খোদ দিল্লিরই বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে হ্যা হ্যা করে হেসে না ওঠে! প্রশ্ন ছুড়ে না দেয়— 'রাত কত হল!'

'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা।' 'কোমল গান্ধার'-এ মোশন মাস্টার (বিজন ভট্টাচার্য) বারবারই কথাটা বলে। ভাঙা বাংলার 'রঙ্গ'-এর আখ্যান 'কোমল গান্ধার', দর্শক একেবারেই নেয়নি। তার একটা কারণ, সংহত কোনো গল্প ছিল না। সম্ভবত আর একটা কারণ, প্রকটভাবে গণনাট্য আন্দোলনের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছিল সে বস্তুতে সাধারণ দর্শকের আকর্ষণ বোধ না-করা। কিন্তু ঋত্বিকচর্চায় ফিল্মটি অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভাঙা বাংলার ট্র্যাজিডিকেই চূড়ান্ত না মানার প্রবল ব্যাকুলতা সাংস্কৃতিক একতায় স্বস্তি পেতে চেয়েছে এই ফিল্মে। আগাগোড়া তাই বিয়ের গান ব্যবহার করেন। সেটা বড়ো কথা নয় খুব। ফিল্মটিতে আঙ্গিক নিয়ে এত নতুন পরীক্ষা করেছেন যা ছাত্রের মতো বারবার পাঠ করে মর্ম বুঝতে হয়, শিখতে হয়। কে ভুলতে পারে রেল লাইন ধরে ছুটে চলা ক্যামেরার সেই ব্যঞ্জনাময় দৃশ্য যার অন্তিমে আসে প্রচণ্ড অভিঘাত। দুই বাংলার মধ্যে সেতুহীনতা, কিংবা আরোপিত বিচ্ছেদ, কী অব্যর্থ ভাষায় বলা হয় এই দৃশ্যপুঞ্জে! আজ তো প্রতিপন্ন হয়ে রয়েছে, সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতার উপরে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কেমন বিপর্যয় এবং বিনাশ ঘটায়। ভৃগুর (অবনীশ ব্যানার্জি) দাম্ভিক শ্রেয়ত্বাভিমান ঘা খেলে বন্ধু তাকে বলে, নেতৃত্ব যারা করতে জানে তাদের শ্রদ্ধা করাই উচিত, কিন্তু মাঝে মাঝে পশ্চাদ্দেশে লাথি মারাও কর্তব্য, তখন হঠাৎই মনে হয় জনগণ এই দায়িত্ব পালন করলে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এমনভাবে ভেঙে যেত না সম্ভবত। ক্ষমতা কত নেতাকেই না

ব্যক্তিপূজার উঁচু মঞ্চে তুলে দিয়েছে! এইসব তীক্ষ্ণ অবলোকন গল্পের বৃত্ত থেকে ইতিহাসের ব্যাধির দিকে আলো ফেলে চমকে দেয়।

ঋত্বিকের কাজে মহাকাব্যিক বিস্তারের দিক থেকে 'তিতাস একটি নদীর নাম'-কে শ্রেষ্ঠ ভাবাও যায়। নানা প্রসঙ্গে ঋত্বিক বলেছেন যন্ত্রপাতি এবং অন্য প্রযুক্তিগত অসুবিধের মধ্যে তাঁকে পূর্ববঙ্গে কীভাবে কাজ করতে হয়েছে। তারই মধ্যে একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর বাঁচা এবং নির্মূল হয়ে যাওয়ার এই আখ্যান তাঁকে নির্মাণ করতে হয়েছিল। তিতাস পাড়ের মৎস্যজীবী সম্প্রদায় নদী-নিয়তির হাতে মার খেয়ে নির্মূল হয়ে গেছে। এই হল ভাঙন। কিন্তু ছবিটির শেষে নদী থেকে জাগা জমিতে ধানের স্বপ্ন আর শিশুটির ভেঁপু-বাজানো-দৌড় সভ্যতা বিস্তারের স্তরান্তর সূচিত করে রাখে। দৃশ্যগত এবং ধ্বনিগত মহিমায় এত বড়োমাপের কাজের আর নজির নেই ভারতীয় সিনেমায়। 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'-ও (১৯৭৪) ভিন্ন অর্থে নজিরবিহীন ছবি। নিজেরই জীবনের শক্তির দিক, দুর্বলতার দিক নিরাসক্তভাবে ছবিটির বিষয় করে তুলেছেন। সমকালের বাংলার এবং নিজেরও নষ্ট ভ্রষ্টতা তীক্ষ্ণ বীক্ষণের আলোয় ধরেছেন। একটা প্রখর ডিসকোর্সকে ফিল্মের ভাষায় প্রকাশ নিয়ে আর তো কোনো পরীক্ষা আমাদের সিনেমায় সত্যিই হয়নি।

বলতে পারি না যে ঋত্বিক ঘটকের প্রতিভার সম্ভাব্য ফসল সব আমরা পেয়েছি। কিন্তু মাত্র ক-টি কাজ করেছেন তাতে ফিল্মের মাধ্যমকে আমাদের জটিল জীবনের, জটিল ভারতীয় বাস্তবতার ব্যবচ্ছেদে অব্যর্থভাবে ব্যবহার করেছেন। আমাদের ফিল্মের ইতিহাসের দিক থেকে ভাবলে মানতে হয়, একটি নতুন শিল্পভাষা দেশের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী করে দিতে ঋত্বিকের কাজের গুরুত্ব অসামান্য। অন্যদিকে ফিল্মের ভাষা শিখতে চান যাঁরা তাঁদের জন্য ঋত্বিকের কাজে অনুশীলন-যোগ্য প্রচুর প্রয়োগগত নজির সঞ্চিত আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, 'কোমল গান্ধার' ব্যবসার দিক থেকে ব্যর্থ হবার পরে হতাশ ঋত্বিক কিছুদিনের জন্য, বছর দু-এক, পুনের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট ইন্ডিয়া'-য় অধ্যাপনা করেছিলেন। সময়টা ভিন্ন অর্থে তাঁর জীবনের একটি সৃজনশীল পর্ব, যা স্মরণ করে আনন্দ পেতেন। কিছু শক্তিমন্ত তরুণকে ছাত্র পেয়েছিলেন। তাঁদের নিয়ে কাজে মেতে থাকতেন। বাংলার বাইরে তাঁর মর্যাদা এই ছাত্রদলের কাজে একটা পরম্পরার মতো। এঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়েছেন মণি কাউল (জন্ম ১৯৪৪), যাঁর ছবি 'উসকি রোটি' (১৯৭০), 'দুবিধা' (১৯৭৩), 'ঘাসিরাম কোতোয়াল' (১৯৭৯); বিখ্যাত হয়েছেন কুমার সাহানি (জন্ম ১৯৪০) যাঁর ছবি 'মায়াদর্পণ' (১৯৭২), 'তরঙ্গ' (১৯৮৪), 'কসবা' (১৯৯১)। সিনেমাটোগ্রাফিতে কে. কে. মহাজন। অভিনয়ে শত্রুঘ্ন সিনহা, রেহানা সুলতানা ইত্যাদি। তাঁর অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে আরো ছিলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত পরিচালক সৈয়দ আখতার মির্জা ও আদুর গোপালকৃষ্ণন। এই সময়ের ছাত্ররা শিক্ষাগুরু ঋত্বিক ঘটকের প্রভাব এবং ঋণ স্বীকার করেন।

একই সময়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেন মৃণাল সেন (জন্ম ১৯২৩)। মৃণাল সেন হঠাৎ সিনেমায় এসে পড়েননি। সংকল্প গঠন এবং অনেক প্রতিবন্ধ পেরিয়ে নিজের পথ তাঁকে তৈরি করে নিতে হয়েছিল। ফিল্ম আঙ্গিকে পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পরীক্ষার প্রাথমিক স্তরে মৃণাল সেন কাজ শুরু করেছিলেন পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকের জনপ্রিয় বাণিজ্যিক ছবির স্তর থেকে। প্রথম ছবি 'রাতভোর' (১৯৫৫), 'নীল আকাশের নীচে' (১৯৫৮), এমনকি 'বাইশে শ্রাবণ'-ও (১৯৬০) গল্প বলার ছবি, গল্প ভাঙার নয়। অবশ্যই প্রথম দুটি ছবিতেও চমকে দেবার মতো দৃশ্যপুঞ্জ ছিল। অন্যদিকে তাঁর শিল্পদৃষ্টি গঠিত হয়েছিল গণনাট্য আন্দোলনের অভিজ্ঞতায়। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঋত্বিকের মতোই জীবনদর্শনে মার্কসবাদী অবস্থান মান্য করেও ফলিত মার্কসবাদের পার্টি স্তরের পরিবেশের, নিরন্তর দ্বন্দ্বের মধ্যে নিজেদের শিল্পীসত্তার বিকাশ অব্যাহত রাখার সচেতন আয়াস চালিয়ে আসতে হয়েছে। মৃণাল সেনের দীর্ঘ ফিল্ম-শিল্পের সৃজনধারায় এই বোঝাপড়াটা বেশ প্রকট। কীভাবে দেখা হবে কোনো ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে, কীভাবে সমকালের জটিল বাস্তবকে সুস্থির ব্যাখ্যায় ধরা যাবে—এই তত্ত্বগত ভাবনা থেকে তিনি বিষয় নির্বাচন করেন। এক-একটি পরিস্থিতিকে সুস্পষ্ট করে তুলতে চান সেই বাস্তবের পটে মানবিক আবেগ অনুভূতির প্রতিক্রিয়া-বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে। তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ কাজগুলি কোনো-না-কোনো চিন্তার্থের বনেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর আত্মবিকাশের পর্বে পর্বে যেসব বিষয় ধরতে চেয়েছেন তাকে নিশ্চয়ই বাংলার বা ভারতীয় জীবনের যাবতীয় দুর্দৈবের মূল বলা যায়। পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে থাকে ঔপনিবেশিক শাসনের জের—সমাজের স্তরে স্তরে। এরই পটে বারবার ফিরে আসে পরিব্যাপ্ত দারিদ্র্যের কথা, মন্বন্তরের কথা, প্রচণ্ড দারিদ্র্যের চাপে মানুষের নৈতিক ভাঙনের কথা। এই প্রসঙ্গই ছিল তাঁর তৃতীয় ছবি 'বাইশে শ্রাবণ'-এর থীম, যা আবার ব্যবহার করেন 'কলকাতা-৭১'-এ (১৯৭২), 'মৃগয়া'-য় (১৯৭৬), 'ওকা ওড়ি কথা'-য় (১৯৭৭) এবং ভিন্ন তাৎপর্যে 'খারিজ' (১৯৮২) এবং 'খণ্ডহর'-এ (১৯৮৩)। এই দীর্ঘ সময় জুড়ে একটিই মূল থীম ব্যবহার করলেন—কিন্তু কোনোটিকেই আগের কাজের পুনরাবৃত্তি বলা যাবে না। বোঝা দরকার, ঠিক কি বিশিষ্টতায় ছবিগুলি আলাদা হয়ে যায়। তিন দশক ধরে প্রবল সম্ভাবনাময় একটি শিল্পমাধ্যম নিয়ে কাজ করতে করতে মাধ্যমটির নিহিত শক্তি সম্পর্কে ধারণার দ্রুত বিবর্তন ঘটেছে। কী বলছি তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ কেমনভাবে বলছি তার গুরুত্বও অপরিসীম। ভাবতে হয়েছে কীভাবে বললে বিষয়টি অব্যর্থভাবে ঘা দেবে, প্রশ্ন উঠবে, বিতর্ক হবে। 'বাইশে শ্রাবণ'-এর ন্যারেটিভ থেকে সরে এলেন। অভিঘাত সরাসরি হোক, প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক হোক, প্রশ্ন উঠুক তীক্ষ্ণমুখ—এই ঝোঁক মৃণাল সেনের ব্যক্তিগত বিকাশের দিক থেকে বিশেষ করে চিহ্নিত করা যাবে। মনে পড়বে, 'কলকাতা-৭১'-এ মৃণাল সেন অসংকোচে এক-একটি

অংশের পরে 'দারিদ্র্য' কথাটা প্রক্ষেপ করা সংগত মনে করেছিলেন। শুভাপ্রসন্নর আঁকা ছবি ব্যবহার করেছিলেন। এখন মনে হতে পারে শিল্পের নিজস্ব যা জোর তার উপরে যেন পুরো ভরসা করতে পারছিলেন না। মনে হতে পারে, একজন যোগ্য শিল্পীর পক্ষে এত ধৈর্যহারা না হওয়া ভালো। যে ধৈর্য, শিল্পের সংযম তিনি ফিরে পান 'ওকা ওড়ি কথা'-য়। প্রেমচন্দকে অনুসরণ করে সমাজের একেবারে অবতলের মানুষের সম্পূর্ণ নিরুদ্যম আচরণে আত্মরক্ষার নির্মম এক আখ্যান বলেন। এই ধারায় পরম অস্বস্তি এবং বিষাদে ভরে দেওয়া ছবি 'খণ্ডহর'। 'খণ্ডহর' অবশ্যই নিছক দারিদ্র্য নিয়ে করা ছবি নয়। শহুরে আধুনিকতা থেকে আমাদের নিয়ে ফেলেন সময় হারানো আর এক ভারতবর্ষে। সেখানে মুমূর্ষু মায়ের প্রত্যাশাপূরণের ছলনা, আইবুড়ো মেয়ের বয়ে যাওয়া যৌবন, ভেঙে পড়া বিশাল এক সৌধের আলো আঁধারিতে জমাট হয়ে যাওয়া কালপ্রবাহ —সবই এক তীব্র প্রতীকে কেলাসিত হয়ে ওঠে। কখনো মনে হয় ইতিহাস নিয়তির মার খাওয়া এই ভারতবর্ষের যে যন্ত্রণা মৃণাল সেন নানা দিক থেকে ধরতে চেষ্টা করেছেন সারাজীবন—এই একটি ছবিতে সেই অন্বিষ্ট একেবারে অব্যর্থভাবে মুঠিতে আনতে পারলেন। ইতিহাসবোধ এবং অভিব্যক্তির শিল্পগত যুক্তি এমন জ্যাবদ্ধ দেখি না তাঁর আর কোনো ছবিতে। বলতে ইচ্ছে হয়, এটি তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ। ভারতীয় সিনেমায় আধুনিক পরিশীলিত শিল্পভাষা প্রয়োগের একটি নিখুঁত দৃষ্টান্ত।

উল্লেখযোগ্য কাজ আরো অনেক তাঁর। একটু পিছিয়ে গিয়ে দেখতে হয় কেমনভাবে তিনি সিনেমায় রাজনীতির ডিসকোর্স আনেন। সেও একটা পর্যায় যা একসময়ে চলচ্চিত্র ভাবুকদের বিতর্কে নামতে বাধ্য করেছিল। 'ইন্টারভিউ' (১৯৭০), 'কলকাতা ৭১', 'পদাতিক' (১৯৭৩), 'কোরাস' (১৯৭৪) আমাদের গল্পখোর রুচির প্রত্যাশাকে একেবারেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। সিনেমার আঙ্গিকে অভিজ্ঞতা বিস্তারের দিক থেকে কাজে এসেছিল, বোঝা যাচ্ছিল সে সময়ের ইউরোপীয় সিনেমায় ফর্মভাঙার পরীক্ষার সঙ্গে মৃণাল সেন আমাদের সিনেমাকে যুক্ত করে দিতে চেষ্টা করেছেন। অনেক সময় গেল তারপরে। এখন মনে হতেই পারে নিয়মভাঙার সাহস, সঞ্চারের দিক থেকে স্মরণীয় হলেও এদের কোনো অর্থে শ্রেষ্ঠ কাজের মর্যাদা দেওয়া যায় না। 'কলকাতা-৭১' অবশ্য এর মধ্যে বড়ো মাপের কাজ।

মৃণাল সেনের উত্তরপর্বের ছবিতে ছোটো বিষয় নিয়ে ভেতর থেকে ব্যবচ্ছেদ করে আমাদের বাস্তবকে চেনানোর একটা ভিন্ন শৈলী এসেছে। 'একদিন প্রতিদিন' (১৯৭৯), 'আকালের সন্ধানে' (১৯৮০), 'খারিজ' (১৯৮২), 'একদিন অচানক' (১৯৮৯), 'মহাপৃথিবী' (১৯৯১) এবং 'অন্তরীণ'-কে (১৯৯৩) এই পর্যায়ে রাখা যায়। এ-জগৎটা একান্তই মধ্যবিত্তের। মধ্যবিত্তের কৃত্রিম মূল্যবোধ এবং নিঃসহ মানুষের ভেতর জগতের দ্বন্দ্বাত্মক নাট্য—বলা যায় এই পর্যায়ে বিষয়দুটি ব্যবহার করেছেন। খুবই উত্তীর্ণ কাজ আছে এর মধ্যে। 'একদিন প্রতিদিন'-এ রীতিমতো গভীর চিন্তার্থের উদ্দীপনা রয়েছে।

'ভুবন সোম' (১৯৬৯) একটি অনবদ্য কাজ এবং আলাদা করে স্মরণযোগ্য। হিন্দি ছবির রাক্ষুসে বাজেটের পাশে সামান্য টাকায় ছবিটি তৈরি করে মৃণাল সেন হিন্দি বলয়ের পরীক্ষামূলক ছবির তরুণ পরিচালকদের একটা পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, ওড়িয়া ভাষায় 'মাটির-অ মনিষ-অ' (১৯৬৬) এবং তেলুগু ভাষায় 'ওকা ওড়ি কথা' করে মৃণাল সেন ভারতীয় সিনেমায় প্রাদেশিকতার গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছিলেন। বাংলার পরিচালকদের কেউ হিন্দি ভিন্ন অন্য কোনো ভাষার কাজ করার কথা ভাবেন না। ওড়িয়া, তেলুগু, হিন্দি— তিন ভাষারই সিনেমায় মৃণাল সেনের প্রভাব পড়েছে।

৫

ভেবে পরিতাপ হয় বারীন সাহার (১৯২৫-৯৩) মতো পারঙ্গম পরিচালক একই বছরে (১৯৬৯) মাত্র দুটি ছবি, 'তেরো নদীর পারে' আর স্বল্পদৈর্ঘ্যের 'শনিবার' করে ফিল্ম জগৎ ছেড়ে গেলেন। বারীন সাহা সমকালীন পরিচালকদের মধ্যে চলচ্চিত্রবিদ্যায় রীতিমতো শিক্ষিত ছিলেন। ফ্রান্সে এবং ইতালিতে চলচ্চিত্র বিষয়ক কোর্স করেছিলেন। সার্কাস দলের ক্লাউন (জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়) আর নাচিয়ে মেয়ের (প্রিয়ম হাজারিকা) সম্পর্ক নিয়ে কাহিনিটির পুরো শ্যুটিং করেছিলেন আউটডোরে। এই ছবির অসামান্য কিছু দৃশ্যপুঞ্জ স্মৃতিতে রয়ে গিয়েছে। বাদল সরকারের নাটক 'শনিবার'-এর চলচ্চিত্ররূপ দিয়েছিলেন সম্পূর্ণই বিপরীত আঙ্গিকে। বাদল সরকার বলেন, 'তেরো নদীর পারে'তে যেমন ফিল্ম ল্যাঙ্গুয়েজের চূড়ান্ত প্রয়োগ হয়েছে, 'শনিবার'-এ তেমনি deliberately film language-কে ব্যবহার করেনি। এখানে থিয়েটারের ল্যাঙ্গুয়েজটাই ব্যবহার করেছেন।' (*চিত্রভাষ*, জুলাই ৯৩-জুন ৯৪, পৃ. ৪১)। 'শনিবার' কখনো দেখাবার ব্যবস্থা হয়নি।

ঢেউটা বাংলা থেকেই উঠল। শিল্পিত চলচ্চিত্রের স্থায়ী প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধান করবেন যাঁরা, তাঁদের মানতে হবে বাংলার মুখ্য তিনজন পরিচালক সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন ও ঋত্বিক ঘটক। এঁদেরই ধারাবাহিক কাজে বিশ্বে ভারতীয় চলচ্চিত্র মর্যাদা পেল। তিনজনের কাজ মিলিয়ে ভাবলে নিশ্চয় বলা যায়, ঐতিহ্যগরবি অথচ বিধ্বস্ত ভারতীয় বাস্তবের বৈচিত্র্যময় এবং জটিলতাময় মুখ এই তিন ফিল্ম-শিল্পীর কাজে উঠে এল। তিনজনের কাজে তফাত নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তিনজনই স্বদেশের বাস্তবকে আন্তরিকভাবে বুঝতে চেয়েছেন। এই একটা শক্ত ভিত তৈরি হল আমাদের সিনেমায়।

ফিল্মের প্রতিষ্ঠা হল আমাদের বাস্তবে। এইসব সফল এবং তাৎপর্যময় নজির সারা ভারতবর্ষে ক্রমে প্রভাব বিস্তার করেছে। তরুণ প্রজন্মের দৃষ্টিবান জিজ্ঞাসু অনেকে ফিল্ম নিয়ে পরীক্ষামূলক কাজে এগিয়ে এসেছেন। প্রমোদপণ্য হিসেবে চলচ্চিত্র উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে এমন নয়, ভারতবর্ষের বিশাল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের ধারা

বহতা রেখেছে। নতুন সিনেমাকে গ্রাহ্য করেনি, প্রশ্রয় দেয়নি। কিন্তু প্রতিপত্তিময় এত বড়ো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির উপেক্ষা সত্ত্বেও হিন্দি এবং ক্রমে অন্য প্রাদেশিক ভাষায় চলচ্চিত্রেও কোনো-না-কোনোভাবে নতুন চেতনার উন্মেষ দেখা গেছে। সে নবচেতনার ফলাফল এখানে পুরোপুরি বিবেচনা করা যাবে না। তবুও নতুন যাঁরা কাজ করতে এলেন, যাঁদের গরজে ভারতবর্ষময় বিকল্প চলচ্চিত্রের আর একটি ধারা বহমান হতে পারল, তাঁদের মধ্যে কারো কারো কাজের তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করব।

১৯৭৩-এ 'অঙ্কুর' ছবির জন্য শিক্ষিত চলচ্চিত্রের অনুরাগী মহল শ্যাম বেনেগলকে (জন্ম ১৯৩৪) খুব আগ্রহে সমাদর জানালেন। সমাজ সচেতন প্রতিবাদী মেজাজের কাজ, ফিল্মের ভাষায় ভালো দখল প্রমাণ করা একটি তাজা সৃষ্টি। 'অঙ্কুর' তৈরি করার আগে শ্যাম অবিরল বিজ্ঞাপনচিত্র তুলেছেন আর দশ বছর ধরে 'অঙ্কুর'-এর চিত্রনাট্যটি আগলে থেকেছেন। অনেক আয়াসে নিজের পয়সায় 'অঙ্কুর' করলেন। হিন্দি সিনেমার বিষয়ে আঙ্গিকে 'অঙ্কুর'কে তখন আমাদের মনে হয়েছিল একটি প্রবল বিস্ফোরণের মতো। তরুণী শাবানা আজমি অন্ধ্রের গ্রামীণ সমাজের নিগৃহীতা নারীর ভূমিকায় যন্ত্রণাকর শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। এত দূরের কালেও সেই স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে— গর্ভিনী মেয়েটি, লক্ষ্মী (শাবানা), কোন পাতাল থেকে কাঁখে কলসি বয়ে জল নিয়ে উঠছে। মনে রয়ে গেছে, বোবা স্বামীর ভূমিকায় সাধু মেহেরের সন্ত্রস্ত কাতরতার দৃশ্যগুলি। ছবিটির রাজনৈতিক স্বর ছিল নির্বাধ। তারই চূড়ান্তে আসে শেষের দৃশ্য, ছেলেটি ঢিল ছোড়ে প্রচণ্ড রাগে এবং ছবির শেষ মুহূর্তটিতে পর্দা লাল হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, এই সময়টা ভারতবর্ষের এক সংকটকাল। ইন্দিরা গান্ধির শাসন ক্রমাগত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বস্ত করে দিচ্ছে। দেশ চলে যাচ্ছে স্বৈরশাসনের দিকে। 'অঙ্কুর' প্রতিবাদী ফিল্মের একটা ধারা সূচনা করে দিল হিন্দি চলচ্চিত্রের এলাকায়। আশ্চর্য, ছবিটি বাণিজ্যিক দিক থেকেও সফল হল, দেশের মানুষ দেখল এই ছবি। জনমনের স্বৈরতন্ত্রবিরোধী চাপা ক্ষোভকে ছুঁতে পেরেছিলেন শ্যাম। একই প্রতিবাদী মেজাজে পরপর করলেন 'নিশান্ত' (১৯৭৫), 'মন্থন' (১৯৭৬), 'ভূমিকা' (১৯৭৭)। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অনুসন্ধিৎসা ব্যক্তি ও সমাজের বহুমুখী দ্বন্দ্বের তাৎপর্য ধরার জন্য, ইতিহাসের ধারা বুঝবার জন্য বিচিত্র বিষয় আশ্রয় করেছে। এই ব্যক্তিগত বিকাশের পর্বে পর্বে কখনো তাঁর কাজ মনে হয় ঝাপসা, কখনো বোধিদীপ্ত। যেমন আমাদের প্রথম ব্যাপক স্বাধীনতা যুদ্ধ, ১৮৫৭-র সিপাই অভ্যুত্থান নিয়ে করা 'জুনুন' (১৯৭৮) অত্যন্ত দক্ষ রূপায়ণ সত্ত্বেও ইতিহাসের ব্যাখ্যায় বিভ্রমে ভরা মনে হয়। আবার দূরদর্শনের জন্য তোলা জবাহরলালের 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া'-র ফিল্ম ভাষ্য 'ভারত এক খোঁজ' (১৯৮৮ সাল থেকে ৫৩টি এপিসোডে দেখানো হয়েছিল) একটি তথ্যনিষ্ঠ অভ্রান্ত কাজ। এমন তো হতেই পারে। ব্যক্তিগত বিকাশের এসব অসমতা সত্ত্বেও শ্যাম বেনেগল আধুনিক ভারতীয় ফিল্মের ইতিহাসে এক দিক্‌নির্দেশকের ভূমিকা

পালন করেছেন মানতে হবে। অগ্রজের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ বিনতির নিদর্শন পাই সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে তোলা তথ্যচিত্র 'সত্যজিৎ রায়'-এ। সত্যজিৎ চর্চায় এই ছবি অন্যতম প্রধান উপকরণ হওয়া উচিত।

অনেকেই বলেছেন শ্যাম বেনেগল ক্রমে পরীক্ষামূলক শিল্পিত চলচ্চিত্র এবং বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের মাঝের অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছেন। ফলে বাণিজ্যিক দিক থেকে তাঁর ছবি গৃহীত হয়েছে। এই অবস্থানের প্রসঙ্গে বাসু চ্যাটার্জির (জন্ম ১৯৩০) নামও মনে আসবে। বাসু চ্যাটার্জি অনেক সময় দিয়েছেন ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনে। ফিল্মের শিল্পরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়েই তিনি নির্মাণের কাজে এসেছিলেন। ১৯৬৯ সালে মৃণাল সেন করেন 'ভুবন সোম', বাসু চ্যাটার্জি করেন 'সারা আকাশ'। পণ নিয়ে বিয়ে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়ার সেতু তৈরি না হওয়ায় মেয়েটির মানসিক নিরাশ্রয়তা নিয়ে তোলা পরিচ্ছন্ন ছবি 'সারা আকাশ', 'ভুবন সোম'-এর মতোই হিন্দি সিনেমায় সম্পূর্ণ নতুন সম্ভাবনা খুলে দিয়েছিল।

একই সময়ে ঋত্বিক ঘটকের ছাত্র মণি কাউল করলেন 'উসকি রোটি' (১৯৭০)। হিন্দিতে বা গোটা ভারতীয় ফিল্মেই ফিল্মের ভাষা নিয়ে সাহসী পরীক্ষার জন্য ছবিটি স্মরণীয় হয়ে আছে। কাজটি নতুন করে বিশ্লেষণ করলে এখন প্রমাণ করা যাবে, মণি কাউল তাঁর নিরীক্ষার উদ্দীপনা পেয়েছিলেন ফরাসি পরিচালক ব্রেসোঁর কাজ থেকে। ব্রেসোঁর মতোই দেখতে চেষ্টা করেছিলেন, মনের জগৎটি কীভাবে ফিল্মে দৃশ্যমান চিত্রকল্পে ধরা যায়। 'উসকি রোটি' ছবির গল্পের বস্তু সামান্যই। বাইরে জমাট গল্প পরিহার করতেই চেয়েছেন। চিত্রনাট্যও খুব ঘটনাবিরল এবং সংহত। বিস্তারটা আসে বিশাল দৃশ্যপট এবং একই সঙ্গে নায়ক বাস-ড্রাইভার সুচা সিং-এর (গুরদীপ সিং) মানসিক প্রতিক্রিয়ায় চিত্রকল্প সৃজনে। এই ছবির জন্য মণি কাউল প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়েছেন সে-সময়ে। ফিল্মে সব নিয়ম ভাঙার অভিযোগ তো ছিলই, অন্য ধরনের সমালোচনাও এসেছিল সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেনের দিক থেকে। এসব আজ গবেষণার বিষয়। কিন্তু মণি কাউল নিজের নন্দনতত্ত্ব সংগঠনে ফিল্মের বাইরের, শিল্পের ভিন্ন শাখার, বিশেষ করে সংগীত এবং চিত্রকলার অভিজ্ঞতা গেঁথে নিয়েছেন—এই বিস্তারের দিকটির মূল্য বিবেচনার বিষয় হয়ে আছে।

একেবারেই ভিন্ন সমস্যা নিয়ে এম.এস.সথ্যু (জন্ম ১৯৩০) করলেন 'গরম হাওয়া' (১৯৭৩)। কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি এবং গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে সথ্যু ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বাম অবস্থান থেকেই তিনি ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের সমস্যা বিচার করেছেন। উল্লেখ করতে হয়, এই একটি জটিল সমস্যা আমাদের জীবনের, কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সথ্যুর 'গরম হাওয়া' এবং গোবিন্দ নিহালনির 'তমস' ভিন্ন ফিল্মে আর তেমন কোনো কাজ হয়নি। এর আর একটি উদাহরণ হল মণিরত্নম-এর 'বোম্বে' (১৯৯৫)।

সথ্যুর ছবিটিতে সামাজিক রাজনৈতিক জটিলতা প্রচুর, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমিনার (গীতা সিদ্ধার্থ) ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি। ছবির শেষে সথ্যুর সুস্পষ্ট নির্ণয়—বাম আন্দোলনই সংখ্যালঘুর নিরাপত্তার গ্যারান্টি। এ-নির্ণয় ভারতীয় পরিস্থিতিতে যথার্থ মানা চলে। হিন্দি সিনেমায় নতুন চেতনার বিস্তারের আর একটি নজির কেতন মেহ্‌তার (জন্ম ১৯৫২) 'ভবনি ভবই '(১৯৮০)। ভবই এক ধরনের লোকনাট্য। লৌকিক ঐতিহ্যের এই নাটকের আঙ্গিককে কেতন ফিল্মের ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। গল্পটি বলা হয় রূপকথার ধাঁচে। ক্যামেরার কাজে দৃশ্যগুলির বাস্তবিকতার বাঁধন অনেকটাই শিথিল করে দিয়ে রূপকথার মেজাজ আনা হয়। ছবিটি প্রথম গুজরাটিতেই নির্মিত হয়।

বাস্তবের একেবারে অবতলে যাবার দৃষ্টান্ত হিসেবে মনে আসে রবীন্দ্র ধর্মরাজ-এর (১৯৪৬-৮২) 'চক্র' (১৯৮১)। বোম্বাইয়ের আলোকিত চমকদার জীবনযাত্রার আড়ালের জীবন, চালার (বস্তি) অধিবাসীদের চরম অনিশ্চিত জীবনযাত্রার মনুষ্যত্বের অবনমনের রূপায়ণে রবীন্দ্র সুস্থির দৃষ্টি এবং প্রখর সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। চালার অমানবিক পরিবেশে কেন আসে মানুষ, কেমন করে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বুনোট তৈরি হয়, এই বাস্তবে নৈতিকতার নিরিখ কেমন—এইসব জিজ্ঞাসা ছবিটির বিশাল পরিসরের দৃশ্যপুঞ্জগুলির আশ্রয়-ভাবনার মতো। গোটা বস্তি বুলডোজারে ভেঙে দেবার দৃশ্যটি জরুরি অবস্থার সময়ের এই জাতীয় বহু ঘটনার স্মারক। অকালপ্রয়াত রবীন্দ্র ধর্মরাজ-এর হাতে ফিল্মের জোরালো ভাষা ছিল। 'চক্র' দেখে তার ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্পর্কে বড়ো প্রত্যাশা জেগেছিল স্মরণ হয়।

মারাঠি নাট্যকার বিজয় তেণ্ডুলকার (১৯২৮-২০০৮) ভারতীয় সমাজে হিংসার কার্যকারণ নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। তাঁর বোধে ধরা দিয়েছিল, হিংসা প্রায়ই হয়ে ওঠে নিগৃহীত মানুষের প্রতিবাদের উপায়। তিনিই গোবিন্দ নিহালনির 'আক্রোশ'-এর (১৯৮০) চিত্রনাট্য লেখেন। ১৯৮০-র চলচ্চিত্র-সংস্কৃতির আবহাওয়ায় মনে হয়েছিল 'আক্রোশ' নিশ্চিতই ভারতীয় বাস্তবের এক নতুন দিকের ইঙ্গিত করল। স্ত্রীকে হত্যা করার দায়ে বিচারাধীন আসামি ভিখু লহনিয়া (ওম পুরী) বাবার অন্ত্যেষ্টিতে প্যারোলে গ্রামে এসেছে। চিতা জ্বালা হয়। এলোমেলো শিখার আঁচে গোটা দৃশ্য দুলে দুলে ওঠে। হঠাৎ ভিখুর ভেতরে যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে যায়। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই কুঠারের আঘাতে যুবতী বোনকে হত্যা করে এবং ভিখুর গলা চিরে বের হয় অসহ্য আর্তস্বর। সেই স্বর প্রতিধ্বনিত হতে থাকে পাহাড়ে অরণ্যে। আমরা জানতাম ভিখুর স্ত্রী নাগিকে (স্মিতা পাতিল) ক্ষমতাবান মানুষেরা ধর্ষণ এবং হত্যা করেছিল। ভিখুর উপরে নাগিকে হত্যার দায় চাপানোয় সে রুদ্ধবাক হয়ে যায়। ওম পুরীর সমর্থ অভিনয়ে শুরু থেকেই অভিযুক্ত ভিখুর মৌনতা এবং যন্ত্রণাময় শারীরিক প্রতিক্রিয়া একটা অস্বাভাবিক চাপ তৈরি করে। এই কৃৎকৌশলে পরিচালক হিসাবে নিহালনির ক্ষমতা বোঝা যায়।

আর শেষ অবধি, বোনটির জীবনে নাগির মতো অভিজ্ঞতা যাতে না আসে তাই অমনভাবে তাকে সে হত্যা করে—তার এই বিস্ফোরণ দর্শককে আমূল কাঁপিয়ে দেয়। হিংসায় এই প্রতিবাদী ভূমিকা নিহালনির পরের কাজেও অনুবর্তিত হয়েছে। সংশয় হয়—'আক্রোশ'-এ, যা ছিল ইতিবাচক তাৎপর্যে অন্বিত, পরে ক্রমেই সেই হিংসার ব্যবহার মাত্রা এবং যুক্তি হারিয়ে কিছুটা উৎকট হয়ে উঠেছে। যেমন দেখলাম তাঁর আপাতত শেষ ছবি 'দ্রোহকাল'-এ (১৯৯৪)। তিনি কি মাত্রাছাড়া হিংস্রতার পথে 'ফিল্ম নয়ার' (film Noir)-এর দিকে ঝুঁকছেন? কিন্তু গোবিন্দ নিহালনির মহৎ সৃষ্টি 'তমস' (১৯৮৭) প্রমাণ করবে, ভারতীয় বাস্তবের সংকট এবং উত্তরণের উপায় সম্পর্কে পরিষ্কার হিসাব তাঁর মাথায় আছে। সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ভয়াবহতা, তার কার্যকারণ এত বড়ো মাপে আর কেউ শিল্পের ভাষায় ধরতে পারেননি। নিহালনি 'তমস'-এ দায়বদ্ধ শিল্পীর পূর্ণ সিদ্ধাই আয়ত্তে এনেছেন বলব।

বাংলা থেকে জেগে ওঠা শিল্পিত চলচ্চিত্রের উদ্দীপনা ৭০-এর দশক থেকে দক্ষিণ ভারতেও সৃষ্টির নতুন প্রেরণা আনে। দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যে রোমান্টিকতার ঘোর কাটিয়ে বাস্তবমুখী নব্য আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল পঞ্চাশের দশক থেকে। বিশেষ করে কন্নড় সাহিত্যে এই আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠছিল। নতুন ধারার লেখকেরা সমাজের আবহমান সংস্কারগুলির অর্থহীনতা প্রতিপন্ন করা, সাহিত্যের প্রধান নীতি করে তোলেন। তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য হয় ব্রাহ্মণ্য-শ্রেয়ত্বের ধারণা, জাতিভেদ প্রথা। এইসব সামাজিক পিছুটানের মূলে ভূমি-ব্যবস্থার সামন্ততান্ত্রিক বিন্যাস কাজ করে, প্রকট হয় নিম্নবিত্ত মানুষকে শোষণ। সামাজিক অসাম্যের গোড়ায় থাকে শ্রেণিগত অসাম্য। সমস্ত ব্যবস্থাটার অমানবিক দিক উন্মোচন করা নব্য আন্দোলনের ভাবনা-মন্ত্র ছিল। কন্নড় সাহিত্যে এই সমাজ সচেতন নতুন সাহিত্যসৃষ্টির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইউ. আর. অনন্তমূর্তির 'সংস্কারা' (১৯৬৬) উপন্যাস। এই উপন্যাসের ফিল্ম রূপায়ণ ১৯৭০-এ। পরিচালক পট্টভি রাম রেড্ডি (জন্ম ১৯১৯)। ফিল্মের জন্য চিত্রনাট্য লিখলেন গিরিশ কারনাড। পরিচ্ছন্ন, সংযত কাজ 'সংস্কারা'-য় পট্টভি রাম রেড্ডি দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুসমাজের একটি অনড় সংস্কার ব্রাহ্মণ-শ্রেয়ত্বকে আঘাত করলেন। বিষয়টির মধ্যে এমন তীক্ষ্ণতা ছিল যে কারো পক্ষে ফিল্মটি সম্পর্কে উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না। সেন্সারের পক্ষে তো নয়ই। অনাচারী ব্রাহ্মণ নরনাপ্পা (পি. লঙ্কেশ) প্লেগে মারা গেছে। লোকটি নিষিদ্ধ খাদ্য খেত, মদ্যপান করত, তার সঙ্গিনী চন্দ্রি (স্নেহলতা রেড্ডি) নিচুজাতের মেয়ে। এমন মানুষের সৎকার হওয়া প্রায় অসম্ভব। চন্দ্রি, পণ্ডিত প্রাণেশাচার্য-এর (গিরিশ কারনাড) কাছে বিধান চাইলে পণ্ডিত শাস্ত্র খুঁজে বিধান পায় না। ঘটনাক্রমে পণ্ডিতের সঙ্গে চন্দ্রি শারীরিক সংস্রব হওয়ায় পণ্ডিত নিজেকেই অপরাধী এবং পতিত ভাবে। অশান্ত পণ্ডিত ঘুরে ঘুরে কোথাও স্বস্তি না পেয়ে ফিরে আসে এবং নিজেই মৃতের সৎকার করে। উপন্যাসে পণ্ডিত প্রাণেশাচার্য-র দ্বন্দ্ব সংশয়ের

একটা ভিন্ন গভীর মাত্রা ছিল। ফিল্মে সেটা অনেক পরিবর্তন করে আখ্যানটিকে যথাসম্ভব সরল করা হয়েছে। আঘাতের লক্ষ্য অবশ্য খুবই স্পষ্ট। সেন্সারের বাধা কাটাবার জন্য তখনকার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আই. কে. গুজরাল-এর সাহায্য নিতে হয়েছিল। এই একটি ছবিতেই দক্ষিণ ভারতীয় আধুনিক ফিল্মের মূল তানটি যেন বাঁধা হয়ে গেল। এই ধারায় আদুর গোপালকৃষ্ণন (জন্ম ১৯৪১) অবধি বড়ো মাপের কাজ যা হয়েছে সর্বত্রই সমাজবাস্তবতা তীক্ষ্ণমুখ। বিশেষ করে জাতপাতের দ্বন্দ্ব প্রধান বিষয়। মনে হতে পারে, এমন একটি মাত্র সংকীর্ণ বিষয় এতজন মেধাবী মানুষ নিজেদের সৃজন-কল্পনার ভাবাশ্রয় করলেন কেন। এমন সমালোচনাও হয়েছে। জাতপাতের সংঘর্ষের মধ্যে যে আসলে শ্রেণিসংঘর্ষই প্রকাশ পায় দক্ষিণের পরিচালকেরা এই সত্যে মন দেননি। হতেও পারে হয়তো। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্য এবং জাতি ব্যবস্থার অনড় পাঁচিলের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের, শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতিক্রিয়া একটি বাস্তবপন্থী প্রগতিচেতনায় যে সংহত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এই চৈতন্যের প্রতিফলন যেমন সাহিত্যে, থিয়েটারে তেমনি ফিল্মেও পড়া বোধহয় একান্ত স্বাভাবিক।

ঠিক একই বিষয়ে, অনন্তমূর্তির আর একটি রচনা নিয়ে গিরিশ কাসারাভল্লি (জন্ম ১৯৫০) তোলেন 'ঘাটশ্রাদ্ধ' (১৯৭৭)। গ্রামের বেদান্ত স্কুলের বালক ছাত্র নানি (অজিত কুমার) দেখছে এক বিচিত্র জগৎচিত্র। সেই জগতে, সেই স্কুলের পরিবেশে অন্তহীন বিকার বিকৃতি। নানিকে দেখাশুনা করে অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে যমুনা (মীনা কুটাপ্পা)। এক শিক্ষকের সংসর্গে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে প্রচণ্ড পাপবোধে গর্ভপাত ঘটাবার চেষ্টা করে। আত্মহত্যার চেষ্টা করে। সেই সব ভয়াল দৃশ্য আমরা নানির চোখ দিয়েই দেখি। যমুনার পাপমুক্তির জন্য গ্রামের ব্রাহ্মণেরা ঘটশ্রাদ্ধের বিধান দেয়। এই রিচুয়ালে ঘট গর্ভাধারের প্রতীক —যা ভেঙে দেওয়া হয়। শাদা শাড়ি পরা, মাথা কামানো যমুনা পরিত্যক্ত হয়ে বসে থাকে এক গাছের তলায়। কিছু অসম্পূর্ণতা, কিছু ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা হলেও কাসারাভল্লির এই ছবি শুধু দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রে নয়, গোটা ভারতীয় চলচ্চিত্রের আধুনিকতা বিস্তারের সমাজবাস্তবতার ভিত শক্ত করায় খুব গুরুত্বপূর্ণ।

দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা মালায়লম পরিচালক আদুর গোপালকৃষ্ণন। কেরলের ছেলে আদুর পুনের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের গ্র্যাজুয়েট (১৯৬৫)। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য কেরল-এ পরিণত হল। সামন্ততান্ত্রিক শাসন থেকে গেল নির্বাচনে জয়ী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির শাসনে। তারপরে কমিউনিস্ট সরকারের পতন ঘটানো এবং ধারাবাহিক রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার প্রভাব আছে আদুরের ফিল্মে। আত্মবিকাশের বিভিন্ন ধাপে আদুর সমকালীন নানা বিষয় আশ্রয় করেছেন এবং সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মকে আদর্শ ধরে কাজ করেছেন। তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় ফিল্ম 'কোদিয়েত্তম' (১৯৭৭), 'এলিপ্পাথায়াম' (১৯৮১), 'মুখমুখম' (১৯৮৪), 'বিধেয়ন' (১৯৯৩)। আদুর গোপালকৃষ্ণনকে বলা হয় সত্যজিৎ রায়-এর পরে একমাত্র সমর্থ পরিচালক যিনি ফিল্মের

সমস্ত প্রত্যঙ্গের কৃৎকৌশলে সমান পারদর্শী। ইদানীং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র জগতে তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং মাননা ব্যাপক।

দক্ষিণভারতীয় ফিল্মের পরিপ্রেক্ষিতে আদুরকে মনে হয় সকলের মাথা ছাড়িয়ে ওঠা পরিচালক। তাঁর দুটি বড়ো কারণ। বিষয়ের দিক থেকে আদুর দক্ষিণ ভারতীয় আধুনিক ছবির সমাদৃত বিষয় জাতপাতের প্রশ্নের সীমায় আবদ্ধ থাকেননি। দেশের বাস্তবকে, আঞ্চলিক রাজনীতিকে পরিপ্রেক্ষিতে রেখে তিনি ব্যক্তিমানুষের অন্তর্জীবনের জটিল এবং বহুমুখী প্রবণতা বিষয় হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁর ফিল্মে বিষয়ের বাস্তব জমি যেমন জমাট, তেমনি জীবনের অন্তর্বিষয়ী সমস্যার ভিতরে যাওয়ার আর একটি মাত্রা আসে— যাকে বলতে পারি বেধ। আদুর একই বিষয়ের বৃত্তেও কখনো আটকে থাকেননি। বিষয়ভাবনার দিক থেকে তাঁর কল্পনাপ্রতিভার সামর্থ্য অসাধারণ। অন্যদিকে ফিল্মের আঙ্গিকে, চিত্রকল্প ও প্রতীক রচনায়, ধ্বনির অর্থবহ ব্যবহারে, শিল্পনিপুণ সম্পাদনায় ইতিমধ্যেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের সমান প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলার বাইরে ভারতীয় চলচ্চিত্রে এখন তাঁর চেয়ে বড়ো পরিচালক আর কেউ নেই বললেই চলে।

শঙ্করন কুট্টি (গোপী) বিশ্ববিবিক্ষু মন নিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে এবং তাঁর বিকাশের সূত্রে কেরালের সমাজের পরিবর্তন এসে যাচ্ছে 'কোদিয়েত্তম' ছবির কাহিনিবৃত্তে। ভেঙে যাচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক পুরনো সমাজ। প্রতিযোগিতামূলক এক নতুন বিধিব্যবস্থা সমাজে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। এ-সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। বিখ্যাত ছবি 'এলিপ্পাথায়াম' বা 'দি র‍্যাট ট্র্যাপ'-এ মূল চরিত্র উন্নি (কারমানা জনার্দনন) প্রাচীন মূল্যবোধ আঁকড়ে থাকা মানুষ যার পাশ থেকে বোনেরা একে একে সরে যায়। বিষাদে নিঃসঙ্গতায় উন্নি একেবারে বিচ্ছিন্ন জীবনে ঢুকে যায়। যেন কলে পড়া কোনো ইঁদুর। সরল ছকে আদুর এ-ছবিতে কোনো বাণী দেবার চেষ্টা করেননি। সেভাবে স্থূল প্রগতিচেতনার কথা বলার চেষ্টায় বোধহয় শিল্প দাঁড়ায় না আদৌ। উন্নির ব্যক্তিমানুষের, অন্তর্জগতের বাস্তবকে আদুর দর্শকের সংবেদনে প্রতিষ্ঠিত করেন। আবার 'মুখমুখম' ছবিতে এসেছে সরাসরি রাজনীতি। কমিউনিস্ট শাসনের আগের পর্ব ১৯৪৫-৫৫ এবং পার্টি ভাগ হয়ে যাওয়ার পরের পর্ব ১৯৬৪-এর পরের কেরলের পরিপ্রেক্ষিত এই চলচ্চিত্রে আনা হয়েছে। 'বিধেয়ন'-এ আদুর শ্রেণীগত বিরোধের বাস্তবের কাহিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সরল সহজ খেটে খাওয়া মানুষ তোম্মি (এম.আর. গোপকুমার) কেরল থেকে আসে দক্ষিণ কর্নাটকে জীবিকার সন্ধানে। তার সৎভাবে জীবনযাপনের আয়োজন বিপন্ন হয় জমিদার ভাস্কর প্যাটেলার-এর (মামুটি) প্রায় কারণহীন আক্রোশে। তোম্মির স্ত্রী নিগৃহীত হয় ভাস্করের লোলুপতায়। ঘটনার পরিণামে মৃত ভাস্করের দৃঢ় মুঠি থেকে বন্দুক ছাড়িয়ে নিয়ে তোম্মি জলে ফেলে দেয়। প্রতিটি ছবিতেই আদুর পরিব্যাপ্ত বাস্তবের বিস্তারে যাচ্ছেন, নতুন অভিজ্ঞতার বয়ান প্রস্তুত করছেন। তাঁর সৃজনপ্রতিভা ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করে তুলছে।

গোবিন্দন অরবিন্দন-এর (১৯৩৫-১৯৯১) অন্তত একটি ছবি, 'কাঞ্চনসীতা'-র (১৯৭৭) উল্লেখ না করে দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে এই নিতান্ত অসম্পূর্ণ সমীক্ষাও শেষ করা যাবে না। ছবিটি দৃশ্যবস্তুর সম্পদে এত ঋদ্ধ এবং পরিচালক বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত শক্তি প্রকাশ করে এমন সব অসাধারণ চিত্রকল্প নির্মাণ করেছিলেন, যা মনে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। রাম চরিত্রটিকে চেঞ্চু আদিবাসী আদলে রূপায়ণ নাও করতে পারেন কেউ—কিন্তু গোটা ছবিতে ক্যামেরার কাজ, রঙের বিন্যাস এবং ফিল্মের শুদ্ধ প্রকাশরূপ নিয়ে যা পরীক্ষা করেছেন—তার মূল সম্পর্কে উদাসীন থাকা যায় না।

নিতান্ত অসম্পূর্ণ এই রূপরেখা থেকেও বোধহয় বোঝা যাবে, পঞ্চাশের দশকে বাংলা থেকে বাস্তব জীবনমুখী ভারতীয় চলচ্চিত্রের যে শিল্পরূপের বিকাশ শুরু হয়েছিল, কীভাবে ক্রমে সেই সৃজনের প্রেরণা সারা ভারতে ছড়িয়ে গেল। প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাতেই কিছু আগে অথবা পরে কিছু না কিছু পরীক্ষামূলক কাজ শুরু হয়ে গেছে পঞ্চাশের পর থেকে। সেই প্রেরণা আজও অব্যাহত রয়েছে।

৬

আবার বাংলায় ফিরি।

আধুনিক শিল্পিত চলচ্চিত্রের ভাবনাটাই মন জুড়ে আছে। কিন্তু পাশাপাশি বাংলায় এবং হিন্দিতে এবং অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার চলচ্চিত্রে প্রমোদপণ্য হিসেবে চলচ্চিত্রের উৎপাদন কখনো থমকে যায়নি। এই প্রমোদপণ্যকে হয়তো হিচককের ভাষায় ফোটোগ্রাফ অব পিপল টকিং (যোগ করে দেওয়া চলে : সিংগিং অ্যান্ড ডান্সিং অলসো) বলাই উচিত। এই ধারার চলচ্চিত্র একটা বড়ো রকমের ব্যবসার এলাকা। উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে হিন্দি সিনেমার দরুণ আমরা বিপুল পয়সা রোজগার করি। বাংলা বা হিন্দি ছাড়া অন্য ভাষার ছবির ব্যবসায় অত রমরমা অবশ্য নেই। ইদানীং আমরা এই ধারার নাম দিচ্ছি মেইনস্ট্রিম সিনেমা বা পপুলার সিনেমা। এ-সিনেমার জাতগোত্র এবং আবেদনের স্তর ও কারণ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বহু গবেষণাও হয়েছে। কিন্তু দুটি ধারার, শিল্পিত চলচ্চিত্র এবং জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের দুই স্রোতে মেলামেশার কোনো জায়গা আছে কিনা— সেটাও ভাবার বিষয়।

এদিক থেকে বাংলার একটা বড়ো জায়গা অধিকার করে আছেন মধ্যপন্থার পরিচালকেরা। আর্ট ফিল্ম হবে, ক্যানে বন্ধই থাকবে, রিলিজ পাবে না কখনো— এই অবস্থাটা এঁরা মানতে পারেননি। মানুষ দেখবে বলেই তো ফিল্ম করা। যা থাকলে দেখবে, মাত্রা মেনে তেমন বস্তু নিয়ে ছবি কেন করা হবে না। তেমন ছবি পরিচ্ছন্নতায় বক্তব্যে উপভোগ্য তো হতে পারে। তা যদি সম্ভব হয় তাহলে, আর কিছু না হোক, কেবলমাত্র হুল্লোড়ের দিকে দর্শকদের মেতে যাওয়া হয়তো খানিকটা ঠেকানো যায়। আমজনতার একটা অংশকেও অন্তত কিছুটা সংবেদনশীল করে তোলা যায়।

এই যুক্তি অবশ্যমান্য এবং মেনে নিয়েই সম্ভ্রমের সঙ্গে স্মরণ করতে হবে, পঞ্চাশের দশকের পর থেকে বাংলায় এবং হিন্দিতেও বেশ কিছু শক্তিমান পরিচালক কাজ করে এসেছেন। এখানে এই মধ্যপন্থী ফিল্মের কোনো সমীক্ষা করার তেমন দরকার দেখছি না। কয়েকটি নাম উচ্চারণ করলেই ধরা যাবে ঠিক কাদের এবং কোন ধরনের কাজের কথা বলছি।

যেমন রাজেন তরফদার (১৯১৭-৮৭)। আমরা অনেকেই তাঁর সৃজন 'গঙ্গা' (১৯৬০) বা 'পালঙ্ক' (১৯৭৫) মনে রেখেছি। গুছিয়ে গল্প বলা, সংযতভাবে মানুষের আবেগ অনুভূতি চিত্ররূপে ধরে দেওয়া এবং বহতা জীবনের সমস্যা সম্পর্কে সুস্থ দৃষ্টির জন্যই এই ধরনের ছবিগুলি মনে রয়ে গেছে। আরো শক্তিমান মনে করি তপন সিংহ (১৯২৪-২০০৯)-কে। আজকের বাংলা সিনেমার চরম দুর্দশায় মনে হয় আরো দু-চারজন তপন সিংহ যদি থাকতেন আমাদের। আজ টালিগঞ্জ জুড়ে বসে আছেন একেবারেই কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত কিছু ফিল্ম তোলার লোক। ভালো উপভোগ্য ছবি মানুষ আগ্রহ করে যে দ্যাখে তপন সিংহ-র 'কাবুলিওয়ালা' (১৯৫৭), 'ক্ষুধিত পাষাণ' (১৯৬০), 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' (১৯৬২)— এই সব বিখ্যাত সাহিত্য রচনার রূপায়ণের জনপ্রিয়তায় তার প্রমাণ আছে। 'আদমি আউর আওরত'-এর (১৯৮৪) মতো ছবি, যে-কোনো চলচ্চিত্র ঐতিহ্যকে পুষ্টই করে। তপন সিংহ-র অন্যান্য কাজ-এর মধ্যে বিখ্যাত 'এক ডাক্তার কি মৌত' (১৯৯০) এবং 'হুইলচেয়ার' (১৯৯৪)। তরুণ মজুমদার-এর (জন্ম ১৯৩১) কোনো কোনো কাজও এই মূল্য দাবি করতে পারে। অন্তত 'সংসার সীমান্তে' (১৯৭৫) এবং 'গণদেবতা' (১৯৭৯) পেলে আজও দেখা যায়, উপভোগ করা যায়।

৭

গৌরব করে বলারই কথা যে ঋত্বিক-মৃণাল সেনদের পরে আরো একঝাঁক পরিচালক বাংলা এবং হিন্দিতে শিল্পিত চলচ্চিত্রের ধারাটিকে এগিয়ে নিয়েছেন। এদের মধ্যে সবাই ধারাবাহিক কাজ করেননি— হয়তো সুযোগের অভাবে। তাই সকলের ব্যক্তিগত বিকাশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়। কম-বেশি ধারাবাহিক কাজ করে আসছেন অপর্ণা সেন (জন্ম ১৯৪৫), গৌতম ঘোষ (জন্ম ১৯৫০) এবং বিশেষ করে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত (১৯৪৪)।

বাবা চিদানন্দ দাশগুপ্ত ফিল্ম আন্দোলনের আদি জনকয়েকের মধ্যে অন্যতম, মাঝে মধ্যে নিজেও ছবি করেন। বাবার প্রেরণায় এবং বাবার বন্ধু সত্যজিৎ রায়-এর প্রেরণায় অপর্ণা নিতান্ত বালিকাবয়স থেকে অভিনয়ে আসেন। অপর্ণা সত্যজিৎ রায়-এর 'তিন কন্যা'র (১৯৬১) একটি, 'সমাপ্তি'-তে প্রথম অভিনয় করেছিলেন।

পারিবারিক সূত্রে অপর্ণা আমাদের চলচ্চিত্র-সংস্কৃতির আবহাওয়াতেই বড়ো হয়ে উঠেছেন। তাই ফিল্ম করতে আসা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। প্রথম ছবি 'থার্টি সিক্স চৌরঙ্গী লেন' (১৯৮১) বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যে, আঙ্গিকগত বিন্যাসের নিপুণতায় চমৎকার কাজ বলে সমাদর পেল এবং যথার্থই এ-সমাদর ছবিটির প্রাপ্য। কলকাতার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজ দেশের মূল স্রোতের বাইরে রয়ে গেলেন। তাঁদের বিচ্ছিন্নতা আরো তীব্র হয়ে ফুটেছে জেনিফার কেন্ডালের মর্মস্পর্শী অভিনয়ে। সমরেশ (ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়) এবং নন্দিতার (দেবশ্রী রায়) উচ্ছলতার পাশে প্রৌঢ়া স্কুল শিক্ষিকা ভায়োলেট স্টোনহ্যামের (জেনিফার কেন্ডাল) নিঃসঙ্গতা, ছকে বাঁধা জীবনযাত্রার ক্লান্তি, বেদনার মতো বাজে। এই মূল তানটুকু অপর্ণা নিটোলভাবে ধরে দিয়েছিলেন।

কাছাকাছি সময়ে গৌতম ঘোষ দুটি ছবি করেছিলেন। প্রথম 'মা ভূমি' (১৯৭৯), দ্বিতীয় ছবি 'দখল' (১৯৮১)। ক্যামেরার কাজে অসাধারণ দক্ষতা নিয়ে 'গৌতম ছবি করতে এলেন। অন্যদিকে তথ্যচিত্রে তাঁর দখল অসামান্য। ফিচার ফিল্ম করার পক্ষে এসব অভিজ্ঞতা তো কাজে আসতেই পারে। বিশেষত ক্যামেরার উপরে তাঁর দখল অসামান্য। গৌতম তাঁর সব ছবিতেই এই সুযোগ পুরোমাত্রায় কাজে লাগিয়েছেন। সিনেমাটোগ্রাফিতে তাঁর বিশেষ মেজাজ, নিবিষ্ট হয়ে ছবি দেখবার সুযোগ, একটা বাড়তি পাওনার মতো। বিশেষত প্রকৃতির মুড বা ভাবাবহ, নিজস্ব চরিত্র ধরে রাখায় তাঁর দক্ষতা মন ভরিয়ে দেয়। যেমন 'দখল'-এর বহু দৃশ্য মনে গাঁথা রয়েছে। ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যায় বিশাল আকাশের নীচে কাকমারাদের সার দিয়ে হেঁটে যাওয়ার দৃশ্যে কিছুই না, শুধু আন্দির (মমতাশঙ্কর) ঘরের চারপাশের চাষের জমির সজীবতা চোখে ভাসে। এই ফিল্মটির আখ্যানের এবং আখ্যান উপস্থিত করার শৈলীর বৈশিষ্ট্যও স্মরণে রয়ে যায়। যাযাবর ঘরের মেয়ে থিতু হতে চাইছে চাষ-আবাদ ধরে, এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য গৌতম ঘোষ খুব সচেতনভাবে প্রস্ফুট করেছেন। যাযাবররা চাষে আসে যখন, তখন দ্বন্দ্ব অনিবার্য। দ্বন্দ্ব নিজেদের মানসিকতায়, দ্বন্দ্ব জমির দখলদারি নিয়ে। ছোটো এই ছবিটির এই তাৎপর্যের জন্যই আমাদের আধুনিক ফিল্মের বিকাশের ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদা পাওয়া উচিত। অপর্ণার চেয়ে গৌতম কাজ করেছেন অনেক বেশি। প্রচুর তথ্যচিত্রের কথা এখানে তুলছি না। কাহিনিচিত্র 'পার' (১৯৮৪), 'অন্তর্জলি যাত্রা' (১৯৮৭), 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৯২) এবং 'পতঙ্গ' (১৯৯৩)। ফিরে ফিরে ভাবলে প্রশ্ন জাগে ঠিক কী ধরতে চাইছেন গৌতম। তাঁর বড়ো মাপের এই সব উদ্যোগের মধ্যে কি অন্বেষণের কোনো ঐক্যসূত্র আছে? 'মা ভূমি'-তে, বিশেষ করে 'দখল'-এ সমাজ বিবর্তনের একটা ঐতিহাসিক বাস্তব ভিতের মতো হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারপরের ফিল্মগুলিতে বক্তব্যগত শিরদাঁড়াটা যেন তেমন স্পষ্ট করে ধারণায় আনতে পারি না। এত শক্তি ধরেন গৌতম যে তাঁর কাজে বড়ো রকম উত্তরণের প্রত্যাশা সবসময় থাকেই। নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন অদূর ভবিষ্যতে।

সত্তরের দশকের বাংলার ইতিহাসে আজ খানিকটা দূর থেকে চোখ রাখলে সমাজে রাজনীতিতে নানা স্রোতের কাটাকুটি ভাসে। অনেক ভরসা জেগেছিল সত্তরে, অনেক ভরসার সৌধ আবার খুবই ফাঁপা ভিতরে উপরে দাঁড় করানো হয়েছিল। এই সময়ের ছাপ— আমাদের সাহিত্যে তেমন সার্থক শিল্পোত্তীর্ণ কাজে ধরা দিল না, কিন্তু ফিল্মে নানাভাবে তাৎপর্যময় ছাপ রেখে গেল। এ-সময়ে দেশের মূলসুদ্ধ প্রবলভাবে নাড়িয়ে দেওয়া উদ্দীপনা এমনকী সত্যজিৎ রায়ও এড়িয়ে যাননি, 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে (১৯৭২) তার প্রমাণ রয়েছে। মৃণাল সেন একেবারে ঘটনা-সংঘর্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার চোখে এবং নিজস্ব বামপন্থী বিবেকবুদ্ধির উৎসুক চোখে সময়টার চরিত্র ধরতে চেষ্টা করেছিলেন। সময়টাকে সচেতনভাবে দেখার বোঝার সুযোগ বুদ্ধদেব দাশগুপ্তরও ছিল। কবিতায় প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধদেব ফিল্মের শিল্পমাধ্যম নিয়ে পরীক্ষায় শুরুতেই নিজের উপরে খুব গুরু দায় তুলে নিয়েছিলেন। বিপ্লবী চেতনায় আলোড়িত ছবি করার সহজ সরল ছক তাঁকে আদৌ টানেনি। একটা সময় মানুষকে যে আবেগে আলোড়িত করে তাতে নিজেকে সমর্পণ করা, ভেসে যাওয়া বোধহয় সহজ; বড়ো কঠিন সেই সময়ের অন্তর্গত দ্বন্দ্বের বিন্যাস নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণের দায়িত্ব বহন। বুদ্ধদেব এই কঠিন জীবনব্রতে, শিল্পব্রতে নিজেকে বেঁধেছিলেন। তাঁর ফিল্ম আমাদের চলমান সময়ের, পরিকীর্ণ বাস্তবের ভিতরের বিন্যাসে নিয়ে যায়।

এই মনোধর্মের সূত্রপাত তাঁর 'দূরত্ব' (১৯৭৮) ছবি থেকেই ধরা যায়। ভাবাদর্শের সূত্রগুলো ব্যক্তিগত সংকটের মুখোমুখি হতে কতটা সাহায্য করে 'দূরত্ব'-এ মন্দারের (প্রদীপ মুখার্জী) দোলাচল খুব গভীরভাবে এই প্রশ্নটা সামনে নিয়ে আসে। সত্তরের আলোড়িত সময়ের ছাপ ছবিতে ওতপ্রোত। আদর্শগত শুদ্ধাচার বলতে কি বোঝায় মন্দার কারো চেয়ে কম বোঝে না। কিন্তু বিবাহিত স্ত্রী অঞ্জলি (মমতাশঙ্কর) অন্যের ঔরসের সন্তান গর্ভে নিয়ে মন্দারের জীবনে এসে পড়েছিল— সেই বাস্তব মন্দারকে অস্তিত্বের সংকটে ঠেলে দেয়। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ছবিটি দেখা যায়—সেটা সৃষ্টি হিসাবে 'দূরত্ব'-র গৌরব বলব। অঞ্জলি—যার সত্যি সত্যি কোনো পুঁথিপড়া আদর্শগত ভাবাশ্রয় নেই—সে নিজের ভিতর থেকে নিতান্ত মানবিক আবেগের শুদ্ধাচারেই একটা অনড় প্রত্যয়ে দাঁড়ায়। বাচ্চাটিকে নষ্ট করে না। তাকে পৃথিবীর আলো দেখতে দেয় এবং এই মহত্ত্বের সামাজিক ফলাফল কী, তা খুব স্পষ্ট করে জেনেই সে নিজের অবস্থানে অনড় থাকে। বুদ্ধদেব খুব একটা মৌলিক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন। সততার, আদর্শের, সত্যাসত্য যাচাই করার একটা কঠিন অবস্থানে। তাঁর আশ্চর্য আধুনিক নায়িকা মন্দারকে বলে— তোমাকেও ভালোবেসেছি। সে-উচ্চারণে কোনোই খাদ থাকে না। ছবিটি নানাভাবেই শেষ হতে পারত। শেষ হল অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব পেরোনো মন্দারের আন্তরিক অনুকাঙ্ক্ষায়। প্রার্থীর মতো যে অঞ্জলির অনুমতি চাইছে— মাঝে মাঝে আসবে, কথা বলতে। অঞ্জলির

প্রসন্ন স্বাভাবিক সম্মতির মুহূর্তটি একটি মহৎ মানবিক মুহূর্ত হয়ে ওঠে এবং ফিল্মের শিল্পী হিসাবে বুদ্ধদেবকে আমাদের সজাগ আগ্রহের আলোয় স্থাপন করে।

সে আগ্রহের আলো বুদ্ধদেব এ-তাবত মলিন হয়ে দেননি। ১৯৯৩ অবধি সাতটি কাজে, 'নিম অন্নপূর্ণা' (১৯৭৯), 'গৃহযুদ্ধ' (১৯৮১), 'আন্ধি গলি' (১৯৮৪), 'ফেরা' (১৯৮৬), 'বাঘ বাহাদুর' (১৯৮৯), 'তাহাদের কথা' (১৯৯২) এবং 'চরাচর'-এ (১৯৯৩) মননশীল দর্শকদের তাঁর ব্যক্তিগত বিকাশের দিকে আকর্ষণ জাগিয়ে রেখেছেন। কাজগুলিতে নিশ্চয়ই উৎকর্ষের তারতম্য আছে— কোন শিল্পীর কাজেই বা তা না থাকে! কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেশের চলচ্চিত্র-সংস্কৃতির হালফিল অনুর্বর আবহাওয়ায় বুদ্ধদেব-এর সচেতন আত্মবিকাশ, জীবনের এবং শিল্পের মৌল চরিত্র অন্বেষণের দায়বোধ সম্পর্কে ভাবলে তাঁকে অনেক বড়ো ভরসার পাত্র মানতে হয়। চলমান বাস্তব তার সফলতা-বিফলতার সব সার নিয়ে বুদ্ধদেবের ছবির আবহমণ্ডলে মিশে থাকে। ইতিহাস দৃষ্টির অব্যর্থতায় রাজনীতির সংশ্রব যাঁরা মানি— বুদ্ধদেবের ছবির রাজনীতি-সচেতন দিকটি তাঁদের দৃষ্টি এড়াবে না। 'তাহাদের কথা'-কে রাজনৈতিক ছবি হিসেব তো দেখাই যায়। এই স্তরটিও বুদ্ধদেব ভেদ করেন এবং সত্তার গভীরতর স্তরে যান— যে উপলব্ধি বিষয় হিসাবে ব্যবহার, সংযত এবং প্রখর শিল্পসচেতনতা ভিন্ন সম্ভব নয়। তাঁর ছবির সমস্যাগুলি আমাদেরই সন্নিহিত বাস্তব থেকে উঠে আসে। আমাদের বাস্তবের রিক্ততা, আদর্শভ্রষ্টতা, সুযোগসন্ধান, পদে পদে মানিয়ে নেবার নিশ্চরিত্রতা— এসব বুদ্ধদেবের ছবির বাস্তব স্তরটি গড়ে দেয়। তারই মধ্যে ক্রমাগত তিনি নিয়ে আসেন আর এক জাতের চরিত্র— মানুষ হিসাবে যারা একান্ত খাপছাড়া, চেনা বাস্তবে যাদের ঠিক জায়গা হয় না। 'বাঘ বাহাদুর'-এ, 'তাঁহাদের কথা'-য়, 'চরাচর'-এ এমন মানুষেরা ফিরে ফিরে আসে। এইসব কাজে যেন বুদ্ধদেব সাধারণ ভালোমন্দের বিচার পেরিয়ে গভীর নৈতিকতার প্রশ্ন তুলছেন। শুদ্ধতর কোনো জীবনবোধের দিক থেকে সন্নিহিত বাস্তবের মূল্য যাচাই যেন ছবির আপাত বিষয়ের ভিতরের বিষয় হয়ে উঠছে, শাঁস হয়ে উঠছে। এই অন্তঃসারটাই তো শিল্পে বড়ো কাজের ভাবাশ্রয়। তাঁর ফিল্মগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পাঠ করে ধারণা হয়, কোনো একটি ফিল্মে নয়, সব কাজ মিলিয়ে একটা বড়ো সত্য তিনি ফিল্মের শিল্পের অবয়বে রূপ দেবার একাগ্রতায় আত্মস্থভাবে কাজ করছেন। শিল্পের কথাটাও বড়ো কথা। সেদিক থেকে ফিল্মগুলি পাঠ করলেও উপলব্ধি হয় খুব নিবিষ্টভাবে, সচেতনভাবে তিনি নিজের প্রকাশশৈলীটি পরিণতির দিকে এগিয়ে নিচ্ছেন। ছবির ভিড়ের মধ্যেও তাঁর কাজ তাই অনন্যভাবে চিনে নিতে কষ্ট হয় না।

বাংলায় এবং বাংলার বাইরেও যাঁরা ভিন্ন ভাবনা থেকে ছবি করতে চান তাঁদের সুযোগ এখন অতি সংকীর্ণ। সরকারি সমর্থনে ভালো ছবির ধারাটা পুষ্ট হবে এমন সম্ভাবনা ইতিমধ্যে মলিন এবং প্রায় অর্থহীন হয়ে এসেছে। তার মধ্যেও, বহু আয়াসে ছবি যাঁরা

পারছেন তাঁদের রিলিজ না-পাওয়া কাজ মাঝেমধ্যে দেখার সুযোগ হয়। সেও এক বিপদেরই অভিজ্ঞতা—কারণ রীতিমতো উজ্জ্বল কাজ, শিল্প হিসেবে অর্থবহ নিটোল কাজ—কিন্তু মানুষের সামনে ধরবার কোনো উপায় নেই। হঠাৎ জুটে যাওয়া সুযোগে হয়তো দেখবেন সন্দীপ রায়-এর 'হিমঘর' (১৯৯৬) বা বিপ্লব রায়চৌধুরী-র 'শোধ'-এর (১৯৮১) মতো একান্ত নিজস্ব শৈলীর কাজ। একটি দুটি ফিল্মের রসদ সংগ্রহ করতে পারার পরেই এমন অনেক মেধাবী পরিচালক থেমে যাচ্ছেন। দেশের চলচ্চিত্র-সংস্কৃতির বিকাশ খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে।

৮

'পথের পাঁচালী' থেকে ধরলে ভারতীয় আধুনিক চলচ্চিত্রের বয়স হল প্রায় পঞ্চান্ন বছর। পাঁচ দশকের কিছু বেশি সময় কোনো একটি শিল্পের বিকাশ, বিবর্তনের ইতিহাসে খুব বেশি সময় নয়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কাজ যা হয়েছে তার পরিমাণ এবং মূল্যগৌরব কম নয়।

একটি বড়ো কথা, সাহিত্যের নানা আধুনিক আঙ্গিকের মতো, সংগীত-চিত্রকলা-ভাস্কর্যের মতো ফিল্মও আমাদের দেশের সামগ্রিক শিল্পসংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। অন্য দিকে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর থেকে আবিশ্ব চলচ্চিত্র-সংস্কৃতির তাৎপর্যময় যে ইতিহাস, তার মধ্যে ভারতীয় চলচ্চিত্র অত্যন্ত মর্যাদার অবস্থানে রয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার আধুনিক শিল্পরূপ নিয়ে যে-কোনো চর্চায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের গুরুত্ব আজ সর্বত্রই মাননা পায়। ভারতীয় সংস্কৃতিজগতের সাম্প্রতিক পরিবেশে এটা বোধহয় স্পষ্ট, ফিল্মে যত জোরালো কাজ হয়েছে অন্য কোনো শিল্পমাধ্যমে তেমন হয়নি। সম্পূর্ণই বাইরে থেকে পাওয়া একটি আঙ্গিক খুব দ্রুত ভারতীয় সৃজনপ্রতিভায় সুসঙ্গতি পেয়েছে। একজন দুজন বড়োমাপের প্রতিভার কাজে একটা শিল্পমাধ্যম জাতীয় জীবনে মিশে যায় না। বহু স্রষ্টার একাগ্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়েই এমনভাবে দেশের একান্ত নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠতে পারে। সত্যজিৎ রায়-এর আগে থেকেই এই শিল্পমাধ্যমকে আমাদের জীবনে সংলগ্ন করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। সত্যজিৎ রায়-এর অভ্যুত্থান সারা দেশে দ্রুত সৃজনের উদ্দীপনা সঞ্চার করল। তারই ফলে বিগত কয়েক দশক ধরে সারা দেশে এত কাজ হতে পারল।

চলচ্চিত্র উৎসবে বা অন্য কোনো উপলক্ষে যতটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ আসে তার ভিত্তিতে ভাবতে পারা যায়, দেশের প্রান্তে প্রান্তে, ভারতীয় জীবনের প্রবাহ থেকে কত বিচিত্র বিষয় ফিল্মে উঠে আসছে। স্টুডিয়ো চত্বরের কৃত্রিমতার মধ্যে আমাদের চলচ্চিত্র আটকে নেই। জীবনের বাস্তবে গিয়ে কাজ করার প্রবণতায় শিল্পে জীবনে কেমন পরস্পরিত সম্পর্ক গড়ে ওঠে, শিল্প কেমন জীবনে জড়িয়ে যায়, ফিল্মের সৃষ্টিতেই তার

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ধারাবাহিক আমাদের সামনে আসছে। ভারতীয় চলচ্চিত্র ভারতীয় জীবনে সংলগ্ন এবং জীবনের রসে পুষ্টি পাচ্ছে— খুব ভরসা হয় এই সত্যে।

সংকট আছে অন্যদিকে। জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাঁরা ফিল্ম করছেন তাদের কাজ মানুষের সামনে নিয়ে যাবার কোনো শৃঙ্খলাময় আয়োজন নেই। বাণিজ্যিক প্রদর্শকেরা করুণা করে কোনো পুরস্কার পাওয়া ছবি কখনো সখনো হয়তো দেখান। কিন্তু সব ছবিই পুরস্কার পায় না, আর পুরস্কার পাওয়া ছবিই শ্রেষ্ঠ এমন নাও হতে পারে। দরকার পরীক্ষামূলক ছবি দেখাবার জন্য দেশজুড়ে বিকল্প প্রদর্শনের আয়োজন। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে ফিল্ম বিষয়ে তত্ত্বাবধানের জন্য দপ্তর আছে, মন্ত্রীরা আছেন। কিন্তু কোনো সরকারই কিছু অর্থসাহায্য দিয়ে দেওয়ার বেশি বিশেষ কোনো দায়বোধের পরিচয় কখনোই দেন না। পশ্চিমবঙ্গে একটি উজ্জ্বল চলচ্চিত্রকেন্দ্র হল নন্দন। এই নন্দন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সারা দেশ নন্দনে আসবে না। জেলায় জেলায় ছোটো হল করা যেত—যেমন রবীন্দ্রভবন করা হয়েছে। হল বলতে বিশেষভাবে ফিল্ম দেখাবার উপযোগী প্রেক্ষাগৃহ বোঝাতে চাইছি। অধিকাংশ প্রেক্ষাগৃহেরই ধ্বনিপ্রক্ষেপে অসম্ভব ত্রুটি থাকে, প্রোজেকশনও হয় দায়সারা ধরনের। ফিল্মের বক্তব্য প্রদর্শনের ত্রুটির জন্য মার খায়। পরিচালকে দর্শকে বাঞ্ছিত সংযোগ খণ্ডিত রয়ে যায়। ফিল্ম নির্মাণের স্তরে যে শিল্পগত সচেতনতা প্রত্যাশা করি, অন্য প্রান্তে প্রদর্শনেও তো সেই সচেতনতা থাকবে। থাকবে, বা আসবে তখন, যখন আমরা ফিল্মকে একটি মহার্ঘ্য শিল্পবস্তুর মূল্য দেব। কোথাও একটা বড়ো ফাঁক রয়ে গেছে— সেতু বাঁধা হয়নি আজও। সৃষ্টির উদ্দীপনা যত ব্যাপক, গ্রহণ করার উদ্যোগ ততটা নয়। রুচির সংকটে জীবনমুখী শিল্পিত চলচ্চিত্র তাই মার খাচ্ছে।

সম্পাদকীয় সংযোজন : প্রবন্ধটি রচিত হয় ১৯৯৫ সালে এবং প্রকাশিত হয় শরৎ-শীত ১৪০২ সালে চলচ্চিত্রের শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত বিভাব-এর বিশেষ চিত্রনাট্য সংখ্যায়। প্রবন্ধটির গুরুত্ব বিবেচনা করে বর্তমান সংখ্যাতেও পুনর্মুদ্রিত হল। এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। সম্মাননীয় চলচ্চিত্র পরিচালকেরা ১৯৯৫ থেকে ২০১০-এর কালসীমায় আরো বহু উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন যেগুলির উল্লেখ এই প্রবন্ধে নেই। প্রয়াত হয়েছেন চলচ্চিত্র পরিচালক তপন সিংহ। ১৯৯৫ সালকেই প্রেক্ষাপটে রেখে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে প্রবন্ধটিতে তাই সামান্য অতিরিক্ত তথ্য সংযোজিত এবং প্রয়োজনবোধে সংস্কৃত হল।

উল্লেখ্য অন্য ধারার চলচ্চিত্রগুলি, তৈরির বছরটিতে অনেকসময়ই মুক্তি পায় না। সেজন্য চলচ্চিত্রনামের পাশে বন্ধনীতে উল্লেখ করা বছর সর্বক্ষেত্রে চলচ্চিত্রটির প্রেক্ষাগৃহে 'মুক্তির বছর' নয়, চলচ্চিত্রটি যে বছর তৈরি হয় সেই বছর।